স্বামীর ঋণ

বা

দেহের মূল্যে।

উপন্যাস

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

—— * ——

ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য

মূল্য দুই টাকা।

৪৪সি, বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
'সাহিত্য কোণ' হইতে
শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত

বাঁধিয়েছেন : —আইডিয়াল বুক বাণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১২।১, হেমেন্দ্র সেন, ষ্ট্রীট,
প্রচ্ছদ-পট এঁকেছেন :—বরেন বসু।

মুদ্রিত করেছেন :—বি, এন, ঘোষ আইডিয়াল প্রেস।
১২।১, হেমেন্দ্র সেন, ষ্ট্রীট. কলিকাতা।
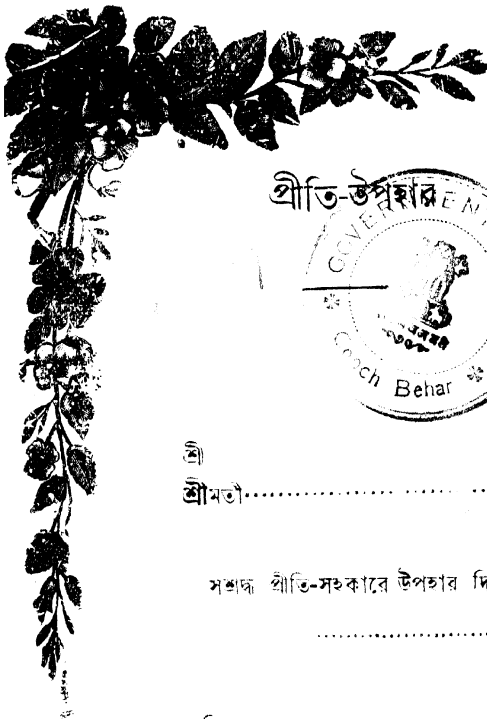
প্রীতি-উপহার

শ্রী
শ্রীমতী...কে

সশ্রদ্ধ প্রীতি-সহকারে উপহার দিলাম।

....

তারিখ ....

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

একটা কথা

বইখানির নাম প্রথম ছিল স্বামীর ঋণ। কিন্তু উহা যখন যন্ত্রস্থ, তখন একটি ক্ষুদ্র চড়ুই পাখী আমাকে এসে জানায় যে ঐ নামে আর একখানি বই বাজারে আছে। তখন পাঠকবর্গের অসুবিধার খাতিরে ইহার ডাক নাম রাখিলাম "দেহের মূল্যে"। মানুষের অনেক সময়ে দুইটি বা ততোধিক নাম থাকে; কোনোটা পোষাকী, কোনটা আটপৌরে। বইয়ের থাকিতে পারে না?

ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার মতো বোধ হয় কোন দোষ হয় নাই।

বিনীত গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণ হইতে এ সংস্করণে অল্প পরিবর্ত্তন ও বহু পরিবর্দ্ধন ঘটিল। জগতের সব জিনিষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে; তবে এ বইয়ের ঘটিবে না কেন?

গ্রন্থকার।

স্বামীর

(১)

ধীরেন পড়তো সস্মিতের সঙ্গে এক কলেজে, এক শ্রেণীতে।

দু'জনের ভাব যতো ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল মেলামেশা। শুধু কলেজে নয়, বাড়ীতেও তারা প্রায় একসঙ্গেই পড়াশুনো করতো, এবং পড়াশুনোর বাহিরেও যতো কিছু যৌথ-কারবার চলতে পারে, সবতাতে তারা ছিল অংশীদার!

মাঝখানে আর একটি ক্ষুদ্র, নিরীহ জীব কখন যে গুটি গুটি পা ফেলে তাদের আসরে এসে দাঁড়াতো, তা' তারা খবরও পেতো না, নতুন কিছুও মনে করতো না। অথচ প্রাণীটি একটু একটু ক'রে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল, তাদের গল্পের মধ্যে, তাদের খেলার মধ্যে, পড়ার মধ্যে—।

ধীরেন কায়স্থের ছেলে, আর এরা ব্রাহ্মণ, এ পার্থক্যটাও এ দলের কেউ মানতো না। খাবার এলে সকলেই একপাত থেকে খেতো, খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করতো।

সস্মিতের বোন্ অমিতা আট বছর থেকে আজ চৌদ্দ বছরে পড়েছে,—এ ক'টা বছর সে ধীরেনের সঙ্গে অবাধে গল্প ক'রে আসছে, পড়াশুনোর দেওয়া-নেওয়া করছে, পড়াশুনা ছাড়াও আরও পাঁচ বিষয়ে তর্কাতর্কি, মত কাটাকাটি গবেষণাদি চালিয়ে এসেছে।

অমিতার শরীরের উপর দিয়ে এ কয় বছরে অবশ্য অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, কিন্তু সেগুলো তার মনের ওপর মোটেই কলম টানতে পারে নি। তার মনটা ছাড় দিয়ে রাখলেও, আর-একজনের মনকে কিন্তু ঐ যৌবনোন্মেষের প্রথম আলোক-বাতাসগুলো বেশ চঞ্চল করে তুলেছিলো। জলের তরঙ্গ জলের ভেতরে বেশী গোলমাল করে না, তার যত প্রতাপ দেখতে পাওয়া যায় তটের ওপর!

ধীরেন ইদানীং বেশ অনুভব করতে লাগলো, তার বেশী ভাল লাগে সম্মিতের চেয়ে অমিতার সঙ্গে গল্প করতে, অমিতাকে একান্তে নিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বোঝাতে, ঘরের কথা ও পরের কথা নানা ফুলে ফলে, নানা আভরণে সাজিয়ে ব্যক্ত করতে!

এটা যে মনের একটা অদম্য আকর্ষণ,—সেটা বুঝতে ধীরেনের বেশী বাকী রহিল না। সেটাকে কি ক'রে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে সে সফল কর্বে, তাই ঠিক করতে তার প্রাণান্তিক আরম্ভ হলো।

পড়াটা হয়ে দাঁড়ালো শুধু বইয়ের পাতা খোলায় পর্য্যবসিত, অর্থ বোধটা সরে দাঁড়ালো অনেক দূরে! অমিতাকে ছেড়ে একলা বেড়াতে, একলা বসতে, দৈনন্দিন যে-কোনও কাজ করতে তার বড়ই ভার ব'লে বোধ হ'তে লাগলো, এমন হলো যে শেষে অমিতাকে একদিন একান্তে পেয়ে স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেল্লে যে তাকেই সে চিরজীবনের সহচরী করতে চায়!

বেচারী অমিতা প্রথমে কথাটা বুঝেই উঠতে পারলে না; কিন্তু ধীরেন যখন আর একবার কথাটা বেশ ক'রে গুছিয়ে বল্লে, তখন সে কিছু কিছু বুঝলে! কিন্তু বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা এসে এমন তার ঘাড় চেপে ধরলে যে, সে মুখ আর উপর দিকে

তুলতে পারেনা ! সে এক বিশেষ বিপদের দিন গেল অমিতার ! সে সে-সময়ের মতো দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে, মুখ আকাশের দিকে. তুলে, তবে বাঁচে !

কিন্তু ধীরেন ছাড়বার পাত্র নয়! সে তার পরদিন আবার কৌশল ক'রে অমিতাকে একটু আড়ালে নিয়ে এসে, নানা রসান দিয়ে কথাটা উত্থাপন করলে, এবং তাদের চিরজীবনের মিলনে যে কতো সুখ ও কতো শান্তিই হ'বে তার একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দিয়ে, ভবিষ্যতের ছবিটা সিনেমার মত ক'রে এঁকে দেখিয়ে দিলে !

সেদিনও লজ্জায় অমিতার মুখটা লাল হয়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সে মরি-বাঁচি ক'রে উত্তর দিলে : তা কি ক'রে হবে ধীরুদা ? তুমি হ'লে কায়েত, আমি হলুম বামুনের মেয়ে : দুজনে বিয়ে হবে কি ক'রে ?

ধীরেন কথাটা শুনে একটু ভ্রূভঙ্গ করলে ; একটু থম্‌কেও বুঝি গেল সে! কিন্তু বেশীক্ষণ গেল না তার, এ সমস্যাটা সরল করতে ! সে একবার ঢোক গিলেই বল্লে : আজকাল আর ও-সব বাঁধন নেই অমিতা ! আজকাল সব জাতের সঙ্গে সব জাতের বিয়ে হচ্চে। আর ভালবাসার কাছে কি জাতির বাঁধন ? আমি তোমাকে যে-রকম ভালবাসি অমিতা,—এমন ভালবাসা আর কোথায় পাবে ?

অমিতা কি একটা ভেবে উত্তর দিলে : ভালবাসো ? ভালবাসলেই কি বিয়ে কর্ত্তে হয় ?

ধীরেন বললে : আচ্ছা, বিয়ে না হয় না করলুম ; চলো আমরা দুজনে কোথায়ও পালিয়ে যাই !

অমিতা ধীরেনের মুখের উপর চোখ তুলে দিয়ে বল্লে : কোথায় ধীরুদা ?

ধীরেন বল্লেঃ চলো পশ্চিমে যাই!

অমিতা বল্লেঃ পশ্চিমে? যেখানে আমার ঠাকুমা গিয়েছিলো? গয়া, কাশী, বৃন্দাবন?

ধীরেন আশা পেয়ে বল্লেঃ হাঁ, সেই সব জায়গায়। বেশ দু'জনে বেড়াবো! একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে গান কর্ব্বো, একসঙ্গে হাতে হাত ধরে পাহাড়ের ওপরে উঠবো; উঠে কতো জীব জন্তু, কতো বাঘ ভালুক, কতো হরিণ খরগোস দেখবো—

অমিতা চুপ ক'রে শুনতে লাগলো। তার মনেও বুঝি ভাবরাজ্যের তুফান ঠেলে উঠছিলো।

ধীরেন আস্তে আস্তে অমিতার বাম হাতের আঙ্গুল দুটো ধরে, আরও বলতে লাগলোঃ অমিতা? সে আমাদের কতো সুখ, ভাবো দেখি! তুমি আর আমি, দুটি মাত্র প্রাণী, আর কেউ নয়! অনন্ত আকাশ, অনন্ত বাতাস, অনন্ত শ্যামল নির্ম্মুক্ত প্রান্তর চারিদিকে ধু ধু করচে—কোথাও কেউ নেই; শুধু মাঝে মাঝে এক আধটা হরিণ—তার জীবনের সঙ্গিনীকে নিয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্চে। চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, শুধু পরস্পর পরস্পরের কাছে মনের কথা কওয়া,—

হঠাৎ অমিতা ধীরেনের কবিত্বপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাসকে বাধা দিয়ে বলে উঠলোঃ না, ধীরুদা, আমার বড় ভয় কচ্চে! আমায় ছেড়ে দাও! আমি যাই!

ধীরেন মর্ম্মাহত হ'য়ে বললেঃ ছিঃ অমিতা! 'যাই' বলতে আছে? তুমি নেহাত কচি খুকিটি নও,—

অমিতা এক টান দিয়ে তার আঙ্গুলগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে বললেঃ না, ধীরুদা! আমি চললুম। আমার কাজ আছে।

ব'লেই অমিতা এক দৌড়ে সেখান হ'তে পলায়ন করলো। ধীরেন

প্রতিহত হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো অমিতার দিকে! তার প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস আরম্ভের মুখেই বাধা পেলো।

* * *

আরও দু'তিন দিন ধীরেন চেষ্টা করেছে অমিতাকে তার প্রাণের দিকে টেনে আনতে, কিন্তু অমিতা সেদিকে আর মোটে ঘেঁস দেয় নি। ধীরেনকে দেখলেই সে পালিয়ে যেতে লাগলো; তার নিজের দাদার পড়বার ঘরে যাওয়া পর্য্যন্ত সে ছেড়ে দিলে; ডেকে পাঠালেও সে আর ধীরেনের সান্নিধ্যে এগুতো না।

কিন্তু ধীরেন যতো বাধা পেতে লাগলো, ততো তার মন সেই দিকেই চলে পড়তে লাগলো। শেষে মনের স্রোতে এমন বন্যা দেখা দিল যে, সে একদিন তার সহপাঠী সস্মিতকে সব কথা খুলে বললে। সস্মিত প্রথমটা একটু রুষ্ট হলো, পরে ধীরেনের অনুরোধে কথাটা ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝে দেখলে; শেষে স্বীকার করলে, তার বাপ মাকে ব'লে যাতে এ বিয়ে হয় তার চেষ্টা করবে।

কথাটা যখন সস্মিতের বাপ শুনলেন, তখন তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করলেন। তিনি গোঁড়া ন'ন বটে, কিন্তু তা ব'লে এক কথায় সমাজের নিয়ম কানুন ভেঙ্গে বিদ্রোহী হতেও রাজি ন'ন। তাঁর আরও পাঁচটি মেয়ে তো আছে; একজনের খাতিরে অপর চার জনকে কুটুম্ব মহলের অনিশ্চিত সম্মতির মধ্যে ফেলে দেন কি ক'রে?

ধীরেনের প্রার্থনা তো পূর্ণ হ'লই না, মাঝে থেকে আর একটা কাণ্ড অযাচিত ভাবে তাহার প্রতিকূলতায় এসে দাঁড়ালো! আগে অমিতা ধীরেনের কাছে লজ্জাশূন্য অ-দ্বিধায় আসছিলো, বাপ মা'র জানাজানির পর, তাহাও বন্ধ হ'য়ে গেলো। শুধু তাই নয়, বাড়ীর লোকে ধীরেনকে ইসারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে যে, তার এ বাড়ীতে

তো আত্মীয়তা ক'রে ঘন ঘন আসাটা বা বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাটা না করলেই যেন ভাল হয়!

(২)

বাপ বেশী দিন সবুর করলেন না, অমিতার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। জোর চেষ্টাও যেখানে, ফলও সেখানে অতি শীঘ্র এসে পড়ে। শেষে অমিতার একদিন বিয়ে হয়ে গেল এক মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ, এম, এ, উপাধিধারী স্ববর্ণের পাত্রের সঙ্গে।

পাত্রটির বয়স অল্প, কিন্তু গাম্ভীর্য্য বেশী; উপার্জ্জন অল্প, কিন্তু বিদ্যা বেশী; স্বাস্থ্য অল্প, কিন্তু পরিশ্রম, শারীরিক কি মানসিক, দুই-টাই অতিরিক্ত। তার মা-বাপ ছিলেন না, তবু আত্মীয় স্বজন এসে জোটে নি; অভিভাবক ছিল না, তবু বদখেয়ালি জোটে নি; অভিমান ছিল না, তবু বোকা আখ্যা কারুর কাছেই পায় নি। অমিতা যখন তার বাড়ীতে প্রথম ঘর করতে এলো, তখন সে প্রথম বুঝলে, সংসারে যত্ন করবার লোক থাকলে, জীবন যাপনের আনন্দ শাখা প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, সঙ্কুচিত হয় না। কুম্ভকার কাঁচা মাটি নিয়ে যেমন ক'রে ঘট গড়ে, অমিতাও এই স্বামীটিকে নিয়ে তেমনি ক'রে গড়তে বসলো।

ভদ্রলোকটি বই-পড়া-বিদ্যে অনেকটা দখলে এনেছিলেন বটে, কিন্তু ভাল চাকরি যোগাড়ের বিদ্যে একেবারেই অনায়ত্ত রেখেছিলেন। কোনও কলেজে প্রফেসরি, কি মোটা মাহিনার চাকরি ত জুটলোই না, জুটলো যা, তা এম, এ, পাশ না করলেও হতে পারতো! এক সওদাগরি অপিসে সত্তর টাকা মাহিনার চাকরি নিয়ে তাঁকে সংসার আরম্ভ করতে হ'লো।

অমিতা একটু একটু ক'রে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো, শুধু যে ভার্য্যার মতো, তা নয়, খানিকটা অভিভাবকের মতোও। স্বামী যেদিন আপিস থেকে আসতে দেরী ক'রে ফেলতো, সেদিন সে চিন্তিত হতো তার শরীরের জন্যে। স্বামীকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য খাওয়াতে সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হতো, এবং শরীর ও মিতব্যয়িতার জন্যে নানা রকম উপদেশ দিয়ে সে স্বামীর ওপর মাঝে মাঝে বেশ মাষ্টারি করে নিতো।

অমিতার সংসার সুখেরই দাঁড়িয়েছিল, কেবল স্বামীর অপটু শরীর ও অপরিমিত পরিশ্রম অমিতাকে মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চঞ্চল করে তুলতো। অমিতা সেজন্য ইদানীং ভগবানকে ডাকতো তার ফাঁকের ঘরে যেন তিনি বিষনয়নে না চান। তার স্বামী—ঈশান বাবুর কিন্তু সেদিকে মোটেই নজর ছিল না। তিনি অমিতার হাতে সব ভার দিয়ে, এমন কি তাঁর শরীরের দায়িত্বও চাপিয়ে দিয়ে নিজে স্বাধীন গৌরবে বেড়িয়ে বেড়াতেন।

দুপুর বেলায় যখন ঈশান বাবু আপিসে বেরিয়ে যেতো তখন অমিতা বাড়ীতে একা ব'সে তার ছোট অতীত কালের পর্দ্দা তুলে কখনো হাসতো, কখনো কাঁদতো, কখনও বা অবাধ স্বাধীনতার জন্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতো। বাড়ীতে দ্বিতীয় জনমনুষ্য কেহ ছিল না, যার সঙ্গে কথা কয়েও সে সময়টা অতিবাহিত করে দিতে পারে। এই অলস অবসরে ধীরেন বাবুর কথা কখনও হয়তো একখণ্ড কালো মেঘের মতো তার স্মৃতির আকাশে আচম্বিতে ভেসে আসতো, কিন্তু তাতে তার ক্রম-বর্দ্ধমান স্বামী-সুখের কোনও দিকটাই আহত হতো না, বরং একটা পরিহাসের পাগলা হাওয়া এসে মেঘটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো।

বছর দুই যেতে না যেতে, মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে অমিতার অনাবৃত দুপুর বেলাও কাজের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। একটি ক্ষুদ্র অতিথি তার অসংলগ্ন কাকলির স্রোত নিয়ে স্বর্গ হতে নেমে এল তার সংসারের মধ্যে। অমিতা খোকাকে পেয়ে আপনার নির্জ্জনতার মরু-দাহ একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেল, স্নিগ্ধ জলের ঝরণায় অমৃত আস্বাদন ক'রে পুলকিত হয়ে উঠলো।

(৩)

পূজার আর দিনকয়েক মাত্র বাকি।

অমিতা খোকাকে কোলে নিয়ে বসে বসে ভাবচে, পূজার উৎসবে কি পোষাকে এমন সোণার পুতুলকে সাজিয়ে তুলবে। অপরাহ্ন গড়িয়ে গেছে: সূর্য্যের আলো যাই যাই ক'রে সহরের মুখের ওপর নাচানাচি কচ্চে। হঠাৎ বাসায়-ফিরে-যাওয়া কতকগুলো কাকের ডাকে অমিতা চমকে উঠে চেয়ে দেখে, ঈশান বাবু দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। খোকাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সে তখনি ঈশানবাবুর আপিসের পোষাকটা ছাড়িয়ে নিতে উঠলো, কিন্তু হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, তার সমস্ত উৎসাহ শিথিল হয়ে পড়লো। মুখখানা সদাই হাসি-হাসি থাকতো, কিন্তু আজ এমন শুখ্‌নো কেন?

সে আর সন্দেহের মধ্যে থাকতে পারলে না, একেবারেই জিজ্ঞাসা করে বসলো: আজ মুখখানা এমন শুখনো কেন?

ঈশান বাবু সংক্ষেপে বললেন: শরীরটা ভাল নয়!

অমিতা আপনার করতলটা স্বামীর কপালের উপর ধ'রে শরীরের তাপ অনুভব কল্লে; করে বল্লে, তাইতো, বেশ জর হয়েছে যে!

ঈশান বাবু অস্বীকার ক'রে বললেন : বেশ জর হয়নি, তবে, হাঁ, একটু অনুভব কচ্ছি বটে !

অমিত্রা স্বামীর জামাটা টান দিয়ে খুলতে খুলতে বললে : আজ তাহার রাত্রে ভাত বন্ধ ; তার বদলে খেতে হবে শুধু দুধসাগু।

ঈশান বাবু তাতে নারাজ ! বললেন : সামান্য জরে দুধসাগু খেতে হয় না ; বরং একটু পাঁউরুটি,—

—না, না, ওসব গোঁয়ারতুমি ভাল নয়। আজকাল দিনকাল বড়ো খারাপ।

—দিনকাল আবার খারাপ কবে হতে হোল অমিতা ? ডাক্তারগুলো ত দেখতে পাই বসেই আছে।

—আর ও আশীর্ব্বাদ করো না যে, ডাক্তার আমার বাড়ীতে ঘন ঘন ঢোকে। একদিন উপোস দাও, কালই দেখবে আবার ঝরঝরে হয়ে গেছো।

ঈশান বাবু পরিহাস করে বললেন : উপোস ? রাত উপোসে হাতি মরে জানো ?

অমিতা বেশ তটস্থ হয়ে উত্তর দিলে : হাতী কিসে বাঁচে, কিসে মরে, তা জানি না। তবে এটা জানি, মানুষের একরাত্রি উপোসে কিছুই হয় না।

ঈশান বাবু বললেন : কিন্তু আমি জানি, মানুষের একরাত্রি উপোস আর হাতির একমাস উপোস, দুই-ই সমান।

অমিতা করপল্লব দুখানি একত্রিত করে বশ্যতার ভণিতা ক'রে বললে : ওগো ভেটেরানারি সার্জ্জন মশায়, আপনি একটু ক্ষান্ত হ'ন, আপনার বিরাট অভিজ্ঞতাটা এখন একটু মুলতুবি রাখুন। আমি দুধসাগু তৈরী করে এনে দিচ্ছি, আজ তাই খেয়েই সন্তুষ্ট হ'ন।

সুতরাং ঈশান বাবুকে সে রাত্রিতে নিয়মিত আহার ছেড়ে নিয়মের আহারই খেতে হোলো। কিন্তু ফল কিছুই হোল না। তার পরের দিনও আবার জ্বর এলো আপিসে। বাড়ী ফিরে এসে ঈশান বাবু অমিতাকে বললেন: কই অমিতা? তোমার ডাক্তারি তো রোগ সারাতে পারলে না?

অমিতা বিষণ্ণ হোলো, কিন্তু তদারক ছাড়লে না। সেদিনও স্বামীকে দুধসাগু খাইয়ে রাখলে।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু ঈশানবাবুর জ্বর ছাড়ে না। তখন অমিতা জিদ্ ধরলে: একজন ভাল ডাক্তার ডেকে এনে দেখাই।

ঈশানবাবু তবু বললেন: না, অমিতা, এ আপনি সেরে যাবে। এর জন্যে ঘটা ক'রে চিকিৎসা করতে হবে না।

অমিতা শুনলে না; সে একরকম জোর করে পাড়ার বুড়ো ডাক্তার নীলমাধব বাবুকে ডাকিয়ে আনলে।

ডাক্তারবাবু এসে ঈশান বাবুকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলেন. ক'রে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলে: কি দেখলেন ডাক্তার বাবু?

বৃদ্ধ মুখখানাকে জোর ক'রে প্রসন্ন ক'রে বললেন: না, এমন কিছু নয়; ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।

তিনি ঔষধের লম্বা ফর্দ্দ ও পথ্যের লম্বা নিয়ম ব্যবস্থা ক'রে বিদায় নিলেন।

কতোদিন ঔষধ ও পথ্যের কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে গমনাগমন করেও যখন ঈশানবাবু জ্বরের হাত থেকে রেহাই পেলেন না, তখন ব্যাপারটা অমিতাকে বেশ চিন্তিত ক'রে তুললে। অমিতা ডাক্তার

বাবুকে একান্তে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলে: ওনার জ্বর সারচে না কেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বাবু ইহার সরল উত্তর দিতে একটু ইতস্তত: করতে লাগলেন। অমিতা সেটুকু বুঝতে পারলে; বললে: আমায় অকপটে খুলে বলুন ডাক্তার বাবু; খারাপ কিছু হলেও আমি তাতে দমে পড়বো না।

ডাক্তার বাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বললেন: কি জানো মা, একটু গোলমাল আছে বলে মনে হচ্চে। রোগটা খুব সাদাসিদি নয়। ওঁর বুকে একটু দোষ দেখা দিয়েছে।

অমিতা চমকে উঠে বললে: বলেন কি?

ডাক্তার বাবু বললেন: হাঁ, সেই-রকম।...তখন তাঁর মাথা চুলকানো থেমে গেছে।

অমিতা শুনে, কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লো। ডাক্তার বাবু তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, সত্যের ওপর মিথ্যার অনেক রাংতা-জড়ানো কথার বস্তা চাপা দিয়ে, অনেক কষ্টে প্রকৃতিস্থ করলেন।

(৪)

কাশীর সঙ্গে দুই দিন রক্ত উঠলো। অমিতা তাই দেখে বেশ বুঝলে যে, ডাক্তারবাবু রোগটা ঠিকই ধরেছিলেন।

এক মাস কাটলো। রুগীর ঘরের কুলুঙ্গীতে অনেকগুলো ঔষধের শিশি ঠেলাঠেলি ক'রে জমা হোল, অমিতার অনেকগুলি পুরাতন সঞ্চয়ের টাকা ছিদ্র পেয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু রোগ যেখানকার, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

তার ইচ্ছা ছিল বাপের বাড়ীতে খবর দেয়, কিন্তু সে দিকেও বিশেষ অন্তরায় ঘটে গিয়েছিল। তার পিতা হঠাৎ একদিন কারুকে কিছু না ব'লে ক'য়েই, ইহকালের খাতাপত্র বন্ধ করেন। অমিতা অবশ্য চিঠিতে খবর পেয়েছিল, কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে তার দেখা হয় নি।

দেখা না হ'ক্, কিন্তু বিপদ অন্যদিক্ দিয়ে আরও তীক্ষ্ণভাবে তাকে জড়িয়ে ধরলে। তার বাপ তাকে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতেন, সেটা এই কয় মাস হ'ল, একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অমিতার ভাইরা বাপের পরিত্যক্ত বিষয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু চরিত্র পায় নি। তারা বোন্‌কে অর্থ-সাহায্য করাকে অন্যায় খরচ ব'লে বিবেচনা করলো।

অমিতার স্বামী ঈশানবাবু যা রোজগার করতেন, তাতে কোনও রকমে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতো, কিন্তু ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার রাখতে পারতো না। কাজেই যখন সংসারে আর একটি পাওনাদার ছোট একটি পেট নিয়ে অমিতার কোলে আসন পাতলে, তখন তাদের অর্থকষ্ট বেশ আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর যখন ঈশান বাবু নিজেও একটি ব্যয়ের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ালেন, তখন পিতার অভাব অমিতা বেশ উগ্রভাবেই অনুভব করতে লাগলো। বাপের বাড়ীতে স্বামীর রোগের খবর দিয়ে যে বিশেষ কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে না, এটা সে এক রকম নিশ্চিত বলেই ধরে নিলে।

কিন্তু তবু মেয়ে মানুষের প্রাণ বিপদের সময়ে আত্মগরিমায় নির্ভর করে থাকতে পারে না; বোধ হয়, সেই জন্যই অমিতা বাপের বাড়ীতেও খবর দিল স্বামীর সাংঘাতিক অসুখের কথা।

দিনকতো সে আশা করলে, তার কোনও ভাই আসবে রুগীর খবর

নিতে। কিন্তু কই, আজ এক সপ্তাহ হল, কারও তো কোনও খবর নেই।

(৫)

বাপের বাড়ী থেকে কেউ খবর নিতে না এলেও, আজ অমিতার মনটা বড় প্রফুল্ল। আজ এখনও পর্য্যন্ত ঈশান বাবুর জর উঠে নি। বেলা পাঁচটা বাজে; শীতের অপরাহ্ণ, দ্রুতগামী সন্ধ্যার গাত্র-কম্বলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আপনাকে বিরল ক'রে তুলেচে। অন্যদিন এর ঢের আগে ঈশানবাবুর জর আসে! কিন্তু সেদিন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং ডাক্তারবাবুর কি একটা ইন্‌জেকসনের জোরে, জরটা এখনও আসে নি। সে জন্যে অমিতার মন আশার আনন্দময় দোলায় দুলে উঠেছে।

সে তখন স্বামীর মাথাটি কোলের উপর টেনে নিয়ে, আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়ে সন্ধ্যার বাতাস ফুর ফুর ক'রে এসে, দুজনকেই সহানুভূতি জানিয়ে বীজন কচ্ছিল। দিনের আলো তখনও ফর্‌সা হয়ে যায় নি, উপহারের শেষ উপাদান নিয়ে তখনও ঘরখানিকে আরতি কচ্ছিল। অনেক-দিনের পর ঈশানবাবুর চোখে আজ প্রকৃতির সাজসজ্জা বড়ো মধুর লাগছিল, তারই খানিকটা অংশ তিনি অমিতাকে বাটোয়ারা ক'রে দিচ্ছিলেন।

—আজ সন্ধ্যাবেলাটা বড়ো চমৎকার লাগচে অমিতা!

অমিতা বল্লে: আহা, ভগবান্ তাই করুন। রোজই তোমার এই রকম জর না থাকে!

ঈশানবাবু বললেন : তুমি কি ভাবো, জ্বর আসে নি বলে আজ এমন ভাল লাগচে ?

অমিতা স্বামীর কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে : তা না তো কি ? অন্যদিন তো তোমার মনে এমন ফুর্ত্তি থাকে না !

ঈশানবাবু বললেন : হাঁ, ফুর্ত্তি আমার মন থেকে ছুটি নিয়েছিল বটে ! তার কারণ, আর কিছু নয় অমিতা ! তার কারণ তুমি ! মরি, তায় দুঃখু নেই, কিন্তু তোমাকে যে হারাতে হবে এইটেই দুঃখু ! যখন ভাল ছিলুম, তখন তুমি যতো মধুর ছিলে, তার চেয়ে বেশী মিষ্টি হয়েছো আমার অসুখের ভেতরে ! আমার অসুখ যেন তোমার ওপরের ছালটা খুলে দিয়েচে ।

অমিতা আবেগভরে স্বামীর চিবুকটি টিপে ধরে বললে : মিষ্টি আমি নই গো, আমি নই ! মিষ্টি তোমার মন ! তোমার মন যেখানে গিয়ে পড়ে, সেইটাই মিষ্টি হয় ।

ঈশানবাবু বললেন : অতো-শতো বুঝতে পারি না অমিতা ! কিন্তু এটা ভাবি, তুমি না থাকলে আমার কি গতি হতো ?

অমিতা বললে : কি আবার হতো ? যে সৌভাগ্যবতী তোমার পা মাথায় তুলে নেবার অধিকার পেতো, সে-ই আমার চেয়ে চের বেশী সেবা ক'রে তোমায় সারিয়ে তুলতো । আমার এক এক সময় মনে হয়, আমার সেবার ত্রুটিতে হয়তো তোমার রোগ সারচে না ।

ঈশানবাবু শীর্ণ মুখে একটু ফিক্ ক'রে হেঁসে বললেন : দূর পাগল ! নিজেকে নিজে চিনতে পারলে না ? সমস্ত রাত জেগে জেগে আমার যে এই সেবা করো, তাতে আমার চেয়ে বড়ো যক্ষ্মারোগও সেরে যেতে বাধ্য । তবে কি জানো, রোগটা খারাপ, তাই দেরী হচ্চে । তুমি না থাকলে আমি হয়তো এতদিন মরেই যেতুম ।

অমিতা মরার কথা শুনে রাগ ক'রে বললে : কি সব অলুক্ষণে কথা বলো তার ঠিক নেই! ওসব কথা যদি তুমি বলো, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কবো না।' ব'লে অমিতা মুখ ফিরিয়ে বসলো।

কিন্তু ঈশানবাবু তাতে একটু মাত্রও দমে না গিয়ে বললেন : ওসব কথা না বললেও আমাকে ও শাস্তিটা শীগ্‌গিরই পেতে হবে অমিতা। কেননা, এ পর্য্যন্ত কেউ পরলোকে গিয়ে আর তার প্রিয়তমার সঙ্গে কথা কইতে পারে নি। সুতরাং আমিও যে পাবো না, এটা নিশ্চয়ই।

অমিতা আরও রাগ ক'রে বললে : যাও—

ঈশানবাবু চোখ বুজিয়ে উত্তর দিলেন : যাচ্ছিইতো অমিতা! আর বোধ হয় আমাকে ফিরতে হবে না!

অমিতা ভয়ানক রেগে গিয়ে, চোখ কপালে তুলে বললে : তুমি কেন ঐ সব কথা ব'লে আমাকে অনবরত দগ্ধাবে বলতো? আমি সমস্ত দিন ধরে সেবা করি ব'লে, আমাকে প্রতিদান দিচ্চ বুঝি?

ঈশানবাবু তেমনই চক্ষু বুজিয়ে, হতাশ ভাবে বললেন : আমার প্রতিদান নয় অমিতা, বিশ্বনিয়মের প্রতিদান! এই রহস্যময় সৃষ্টির রাজ্যে যে ভালবেসে সেবা করে, সেই কষ্ট পায়! এখানে রোগ কষ্ট দেয় না, মৃত্যুও কষ্ট দেয় না, কষ্ট দেয় ভালবাসা!

অমিতা স্বামীর কথা শুনে আর কোনও উত্তর দিতে পারলে না। একটা ভয়ানক সত্যের খবর যেন তার কণ্ঠটা টিপে ধরলে।

ঈশানবাবু আর কিছু কথা বললেন না, চক্ষু বুজিয়ে আগন্তুক ভবিষ্যতের ছায়াময় ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। মুখখানা তাঁর হয়ে গেল ছাইয়ের মত সাদা, নিমীলিত চক্ষুর ফাঁক দিয়ে দু একটা অশ্রুকণা আকাশ-ঝরা নক্ষত্রের মতো জল্ জল্ করতে লাগলো। অমিতা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে যখন স্বামীর মুখের দিকে তাকালো, তখন দেখবামাত্রই

তার মন ডুকরে কেঁদে উঠলো; সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।

(৬)

ডাক্তার বাবু বলছিলেন: দেখো মা, তোমার স্বামীর যে-অসুখ করেছে, সেটা শুধু ওষুধে, সম্পূর্ণ আরাম হবে বলে মনে হয় না। ওষুধের সঙ্গে চাই ভাল হাওয়া আর প্রচুর সূর্য্যের আলো। এ দুটো জিনিষই কোনও ডিস্‌পেন্‌সারিতে কিনতে পাওয়া যায় না, সেটা বোধ হয় তুমি জানো?

অমিতা উত্তর দিল: আমাদের এ বাসাবাড়ীতে এ দুটো জিনিষ কখনও অতিথি হয়েও আসে না; তবে উপায় কি?

ডাক্তারবাবু বললেন: শুধু তোমার বাসাবাড়ী নয় মা, কলকাতার অধিকাংশ বাসাবাড়ীই এই রকম। এই ছত্রিশ বর্গমাইল পরিধির সহরটির মধ্যে কত লোকের বাস জান? ষাট লক্ষ। এই ষাট লক্ষ ঈশ্বর-সৃষ্ট দ্বিপদ জন্তু কোনও রকমে শরীরটাকে দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে এই সহরটাতে বাস করে। শূকরের ছানারা যেমন ক'রে তাদের ছোট্ট আড্ডাটির মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে, এ তার চেয়ে অধম। এদের সম্মিলিত উষ্ণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কলকাতার হাওয়া কেন যে এখনও দাউ দাউ ক'রে জলে যায় নি, এই আশ্চর্য্য। এই হাওয়ায় শুধু যে মানুষের প্রাণধারক গুণ কমে গেছে তা নয়,—কোটি কোটি রোগের জীবাণু এর অন্তরে অন্তরে মৈত্রী ক'রে লোক-জিঘাংসায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই এ কলকাতার হাওয়া কি করে ভাল হবে মা?

অমিতা বললেঃ আমাদের বাসা আবার একতলার ঘরে। সূর্য্য ত কখনও চোরের মতনও উঁকি মারে না, হাওয়াও আসে বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনার মহাপাপ ঘাড়ে ক'রে নিয়ে। আপনি যে-দুটো জিনিষের কথা বলছেন, মাথা খুঁড়লেও আমরা এ দুটো জিনিষ এখানে যোগাড় কর্ত্তে পার্ব্বো না!

—পার্ব্বে না তো? তা হলেই বোঝো, তোমার স্বামীর অসুখ এখানে থেকে কি ক'রে আরাম হতে পারে? সুস্থ সবল লোকেরাও এই আঁস্তাকুড়ের দোকানে শরীরটাকে মুল্যস্বরূপ বেচে ফেলে। তবে, যার বুকে ফুস্‌ফুসের রোগ ধরেছে, সে কেমন ক'রে আরাম হবার আশ্বাস পেতে পারে?

অমিতা ডাক্তারবাবুর কথা শুনে বেশ চিন্তান্বিত হয়ে উঠলো। অথচ এই বাসাবাড়ীটাই পৃথিবীতে তার একমাত্র সম্বল। পল্লীগ্রামে যদি তাদের একখানা চালাঘরও থাকতো, তা হ'লে সে আজ তার পুণ্যের ওপর নির্ভর করতে পারতো। কিন্তু সেটুকুও যে তার নাই!

ডাক্তারবাবু বলতে লাগলেনঃ শোন মা; আমার কথা শোনোঃ আর ওষুধপত্রে পয়সা ব্যয় করো না; তার চেয়ে ঐ পয়সায় পশ্চিমে কোনও জায়গায় গিয়ে থাকো। সেখানে গিয়ে কিছুকাল থাকলে, আমার বিশ্বাস, তোমার স্বামী চলন-সই মতো সেরে উঠতে পারেন।

অমিতা কোনও কথা কইলে না, চুপ করে বসে ডাক্তার বাবুর কথা শুনতে লাগলো।

—আর তাও বলি, এই দুর্গন্ধযুক্ত সহরতলীতে থাকলেই যে ওষুধপত্রে তোমার স্বামীর ঘুষঘুষে জ্বর একেবারে ভাল হয়ে যাবে, তাও ঠিক বলে উঠতে পারা যাচ্ছে না!

পাশের দরজা ঠেলে ঈশানবাবু প্রবেশ করে বললেনঃ বলে উঠতে

পারা যাচ্ছে না কেন ডাক্তারবাবু, বেশ অঙ্কের মতো ভাগফলটা মিলে যাচ্ছে। এখন আমায় বলুন, কি করলে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পিছ্‌লে পড়তে পারি!

ডাক্তারবাবু ঈশানবাবুর দিকে ফিরে তিরস্কারের সুরে বললেন: আপনি আবার বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন কেন? এই পরিশ্রমটুকুর জন্যে আপনার জ্বর বেড়ে যেতে পারে, জানেন?

ঈশানবাবু স্থিরভাবে বললেন: ডাক্তারবাবু, আমায় নিত্যই জ্বরের ভয় দেখান, কিন্তু আমার অসুখ কি শুধু জ্বর? না, জ্বরটা একটা ডাকপিয়ন মাত্র? যে চিঠিগুলো সে বিলি কচ্ছে, তার ভেতরে যতো দুঃসম্বাদ আছে, তার জন্যে দায়ী কি সে? না, যারা সেই দুঃসম্বাদ লিখে পাঠিয়েছে, তারা? আমাকে ভয় পেতে হবে তাদের, যারা আমাকে ধ্বংস কর্ব্বার জন্যে দল বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে। যক্ষ্মার বীজাণু,—

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়ে বললেন: ঈশানবাবু, আপনি বুদ্ধিমান লোক; আপনাকে বলি, আপনি আফিস থেকে মাস ছয়েকের ছুটি নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে থাকুন। আমার বিশ্বাস, তাতে আপনার উপকার হবে।

ঈশানবাবু একটু ম্লান উপহাসের হাসি হেসে বললেন: আপিস্ থেকে ছুটি আমার অনেক দিন নেওয়া হয়ে গেছে। আপিসের সাহেবরা এতো বোকা নয় যে, যক্ষ্মার বীজাণুকে মাহিনে দিয়ে, বসে বসে পোষণ কর্ব্বে!

তা যাক্! চাকরি গিয়ে থাকে, আবার আপনার চাকরি হবে। যদি শরীরটা থাকে,—

এ 'যদি'র দাম কতো তা জানেন ডাক্তারবাবু? এ 'যদি'র

দাম অন্ততঃ হাজারখানেক টাকা। এর কম আমার পশ্চিমে যাওয়া হবে না।

তা লাগবে! হাজার লাগবে! আপনার কোনও আত্মীয় কুটুম্বের কাছে ধার করুন না!

ওষুধে আপাততঃ আর কিছু হবে না বলচেন?

হ'তে হয়তো পারে, কিন্তু অনিশ্চিত।

আর ওষুধের বস্তাও তো অনেক ঘাড়ে চাপালেন। ছুঁচ ফুটিয়েও তো অনেক জামাই-ঠাটা করলেন! কিছুতেই তো কিছু হোল না!

তবে আর কেন? একেবারে পশ্চিমে বেরিয়ে পড়ুন।

কিন্তু পশ্চিমে হাওয়া খেতে গেলেই কি যমদূত আর খুঁজে পাবে না? সেখানে গেলেই যে ভাল হবো, তার নিশ্চয়তা কি?

ডাক্তারবাবু জোর গলায় বললেন: নিশ্চয়তা অনেকটা আছে। আমার স্থির ধারণা, আপনি সেখানে কিছুকাল থাকলেই উপকার পাবেন। ভালো হাওয়া আর সূর্য্যের তাপে যক্ষ্মার বীজাণু তাদের ধ্বংসক্রিয়া স্থগিত রাখে। এটা আমাদের ডাক্তারি বিজ্ঞানে লেখে।

ডাক্তার বাবুর এই জোর গলায় ঈশান বাবুর মনে বেশ অঙ্কপাত হোলো। তাঁর মনে ধারণা জন্মালো, একটা রাস্তা তিনি খুজে পেয়েছেন রোগের হাত থেকে এড়াবার।

আরও অনেক কথা বুঝিয়ে ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন। অমিতা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবচো? ঈশানবাবু উত্তর করলেন: প্রাণ কে সহজে দিতে চায়, অমিতা? আমার যখন টাকা নেই, তখন ধার ক'রে হোক্, ভিক্ষে ক'রে হোক্, আমাকে পশ্চিমে যাবার টাকা

যোগাড় করতেই হবে। তোমার বাপের বাড়ী থেকে কিছু ধার দেবে না ?

অমিতা বিষণ্ণভাবে বললে: আমার তো আশা হয় না। বাবা থাকলে আমি ভাবতুম না। কিন্তু দাদা সে প্রকৃতির নয়!

—একখানা চিঠি লিখেই দেখা যাক্ না।

সে দিন সন্ধ্যায় দুজনে একসঙ্গে বসে অনেক গুছিয়ে একখানা পত্র লেখা হ'ল অমিতার বাপের বাড়ী। আরও দু'চার জন আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকেও সেই সঙ্গে বিশেষ অনুরোধ ক'রে পত্র দান করা হোলো।

তারা উভয়েই অনেকদিন পত্রগুলির উত্তরের আশায় পথের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু পথ একদিনও তাদের দিকে চাইলো না।

আত্মীয়গণের সম্পর্ক আত্মীয়তার,—টাকার নহে। বন্ধুত্বের সঙ্গে টাকার চিরকালই অপ্রণয় ঘটে এসেছে। ঈশানবাবু উত্তরের আশা করে শুধু প্রশ্নের রাশি কুড়িয়ে পেলেন, উত্তর একখানিও পেলেন না।

কোনও দিকে কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে, তিনি মর্ম্মাহত হয়ে পড়লেন। মনের বিষণ্ণতায় রোগ আরও বেড়ে উঠলো। অমিতাও সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের প্রান্ত সীমায় এসে দাঁড়ালো।

(৭)

ঝি এসে বললে: দিদিমণি! আপনার বাপের বাড়ী থেকে একজন বাবু এসেছেন,—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

অমিতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে: বাপের বাড়ী থেকে? আচ্ছা, ও ঘরে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

চোখের কোণটা বেশ করে মুছে নিয়ে, আর মুখখানা আঁচল দিয়ে পরিষ্কার ক'রে, যখন অমিতা গিয়ে বাহিরের ঘরে হাজির হ'ল, তখন যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি বসবার স্থান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা নমস্কার করলেন। অমিতা কিন্তু তাঁকে দেখেই একেবারে চম্‌কে উঠলো। যে লোকটা সকলের চেয়ে এ সময় আসবার অনধিকারী, ঠিক সেই লোকটাই আজ অযাচিত ভাবে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত।

ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: অমিতা? চিনতে পারো?

অমিতা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে: কে, ধী—রেন—বা—বু?

হাঁ; অনেক দিন পরে দেখা! তুমি ভাল আছো?

অমিতা ঘাড় নেড়ে বললে: হাঁ, ভাল আছি! তুমি?

ধীরেন বাবু মুখটা বিষণ্ণ ক'রে বললে: আমার কথা আর জিগ্‌গেস্ কোরো না অমিতা! অনেক বিপদ্ আপদের মাঝখান দিয়ে আমার এই ক'টা বচ্ছর কেটে গিয়েছে। বাবা গেলেন; মা'ও এক বচ্ছর পরে ছেলেকে একলা রেখে সরে পড়লেন।...আর, তুমিতো কিছু খবর টবর নাও না! সেই যে একদিন ঘাড় নাড়লে, আর কোনো সম্বন্ধকেই কাছে ঘেঁসতে দিলে না।

অমিতা চোখ দু'টি তুলে বললে: ও? তাতো জানি নে। তুমি বাপ মা দুজনকেই হারালে! বড় কষ্ট তো?

—আর, কষ্ট ব'লে কি কচ্ছি বলো? আজ সংসারে নিতান্তই আমি একা!

অমিতা সহানুভূতির সুরে বললে: সংসারে একাই হয়ে যেতে

হয় ধীরেন বাবু! মা বাপ তো মানুষের চিরকাল থাকে না!

—মা বাপ থাকে না, কিন্তু আর একজন তো,—বলতে বলতে ধীরেন বাবু থেমে গেল। অমিতা ধীরেন বাবুর মুখের ওপরে অনুসন্ধিৎসু চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিলে। লজ্জায় তার সমস্ত শরীর চমকে উঠলো।

প্রথম যৌবনের সব কথাই অমিতার স্মৃতি পথ দিয়ে একবার ছুটে চলে গেল। তাতে, ধীরেন যে তাকে কতো আপনার করবার চেষ্টা করেছিলো, সে খবরটা যেন তাকে দশবার বিদ্যুতের মতো আহত করতে লাগলো। অমিতা সামলাতে না পেরে সন্মুখের চৌকিখানায় বসে পড়লো।

ধীরেন অবসর খুঁজতে খুঁজতে, এই সময় বলে ফেললে: সে সময় যদি তুমি আমার হতে অমিতা,—তাহ'লে আজ,—

অমিতা সহসা দাঁড়িয়ে উঠে, বলে উঠলো: ধীরেন বাবু? আমার স্বামীর বড়ো অসুখ! আজ তুমি যাও। আর একদিন এসো!

—তোমার স্বামীর অসুখ? কৈ, আমি তো কিছু জানিনে।

অমিতা বিনয় হারিয়ে বললে: জানো না, এখনতো জানলে। এখন যাও, আর একদিন এসো!

—কিন্তু আমার তো তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত।

অমিতা বললে: আমার বোধ হয়, উচিত নয়। তিনি রুগী মানুষ, রোগের যন্ত্রণা নিয়েই ছটফট কচ্ছেন,—তার ওপর তোমার এই পাগলামোগুলো শুনলে আরও হয়তো যন্ত্রণা পাবেন।

ধীরেন বাধা দিয়ে বললে: না, না, আমার আগেকার ইতিহাসের কথা তাঁকে কেন শুনোতে যাব? শুধু তাঁর শরীরের বিষয় জিগ্‌গেস্ করবো।

অমিতা আবেগভরে বলে উঠলো : সেটাও কি তোমার কাছে একটা অনাবশ্যকীয় লোকদেখানি ব্যাপার হবে না ? এইতো আমার কাছে শুনলে, তাঁর শরীর খুবই খারাপ !

তবু ধীরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলে : আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে এতো নারাজ হচ্ছ কেন, অমিতা ? আমি তোমার পর হয়ে গেছি বলে, তুমিতো আমার পর হওনি। আমি এখনও তোমার শুভ কামনা করে থাকি।

অমিতা বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো : তা বেশ করো, ভালই করো। সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু তা বলে আমার স্বামীর কাছে, তোমাকে যেতে দিতে আমি ভয় পাচ্ছি। আমি তাঁকে নিয়ে যে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটি বেঁধেছি, কেন তুমি সেটা জ্বালিয়ে দেবে ?

অমিতার কথা শুনে ধীরেন বাবু খুবই বিস্মিত হ'ল। সে ভাবতে লাগলো, তার উপর অমিতার এমন ধারণা কোথা থেকে হোলো। সে তো এমন কিছু করে নাই, যাতে অমিতা তাকে এমন শত্রুর মতো দেখতে পারে ! ধীরেন তাকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসতো, তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলো, সে ভিন্নবর্ণীয় ব'লে তাদের বিবাহ হয় নি,—এইটাই কি একটা গুরুতর অপরাধ হয়ে গেল ? তাই যদি হয়, ভালো, তাহ'লে এখানে আর বসবার প্রয়োজন কি ? তার চেয়ে,—

ধীরেনবাবু দাঁড়িয়েছিল, সেই অবস্থাতেই ব'লে উঠলো : তা হ'লে আসি, অমিতা ! তুমি যদি আমাকে ঘর-জ্বালানো শত্রু বলেই বিবেচনা করো, সেটা ভুলে যেয়ো। আমি তা নই। আসি।

ধীরেনবাবু চলে যাবার জন্যে পশ্চাৎ ফিরে দু'পা চলেছে, এমন

সময়ে একজন শীর্ণ যুবাপুরুষ হঠাৎ বাড়ীর ভিতর দিক থেকে এসে তার পথ আগ্‌লে ধরলে। ধীরেনবাবু তাকে চেনে না, কিন্তু তাকে বাড়ীর ভিতর দিক থেকে আসতে দেখে আন্দাজ করে নিলে, কে সে হতে পারে।

ভদ্রলোক দরজার উপর দাঁড়িয়ে বললেন: না, না, তা হতে পারে না ধীরেনবাবু! আপনার এখন যাওয়া হবে না! আপনি আমার অতিথি, আপনাকে একটু মিষ্টি মুখ করে যেতেই হবে!

অমিতা তার রোগশীর্ণ স্বামীকে হঠাৎ সম্মুখে দেখে বলে উঠলো: একি? তুমি একেবারে হেঁটে উঠে এলে? তোমার কি একটুও রোগের ভয় করে না?

রোগক্লিষ্ট মুখ থেকে উত্তর এলো: রোগের ভয় করে অমিতা, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভয় করে ভদ্রলোকের অপমানের। তুমি ওঁর প্রতি এমন বিরূপ হচ্ছ কেন অমিতা?

স্বামীর কথা শুনে অমিতার মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল; সে ঘাড়টি নীচু করে শুধু মাটির দিকে চেয়ে রইলো।

সহসা ঘরের মধ্যে এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো যে, একটা স্চ পড়ে গেলেও তার শব্দ শুনতে পাওয়া যেতো।

একটু পরেই, ঈশানবাবু আর একটু এগিয়ে ধীরেনের ডান হাতখানা ধরে বললেন: আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, কিন্তু আপনার কথা শুনেছি আমি সস্মিতের কাছে। আপনার নাম তো ধীরেনবাবু?

ধীরেন শুষ্ক মুখের উপর অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে বললে: আজ্ঞে হাঁ। আমি সস্মিতের সঙ্গে একসাথে পড়তুম।

ঈশানবাবু বেশ আহ্লাদ সহকারে বললেন: বাঃ! তাহ'লে তো আপনি আমাদের ঘরের লোক! তা হবে না, ধীরেনবাবু আপনাকে

বসতেই হবে। আপনি অমিতার কথায় রাগ করলে, আমি ভারি দুঃখিত হবো। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে ধীরেনবাবু, নইলে আপনাকে একটু বসতে অবধি বলে নি।

ধীরেনবাবু করযোড় ক'রে বললে : আজ্ঞে না মাপ কর্ব্বেন, আমি আর বসতে পার্ব্বো না! আমার একটু বিশেষ জরুরি কাজ আছে এই পাড়ায়, সেইটে এখনই সেরে যেতে হবে।

ঈশানবাবু কথা ঘুরিয়ে বললেন : আমার এখানেও আপনার কম জরুরি কাজ নয় ধীরেনবাবু! গেরস্থ বাড়ীতে কোনও ভদ্রলোক এলে, গেরস্থের উচিত তাঁকে বসিয়ে যথাযথ আতিথেয়তা করা। গেরস্থের এই ধর্ম্ম-রক্ষা করাটা আপনি একটা কম জরুরী কাজ ব'লে মনে কর্ব্বেন না।

ধীরেনবাবু ঈশানবাবুর ভদ্রতা দেখে যেমনই সন্তুষ্ট হলো, তেমনই বিপাকে পড়লো। অমিতার সোজাসুজি জবাবের পর সে আর একদণ্ডও থাকতে চাইছিল না, কিন্তু ঈশানবাবুর ঐকান্তিকতা দেখে তার মতলব একটু টলমল হয়ে গেলো ; তবু সে বল্লে : দেখুন, জরুরি কাজ না থাকলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সাগ্রহ অনুরোধ রক্ষা করতুম, কিন্তু কি কর্ব্বো,—

ঈশানবাবু বলে উঠলেন : কর্ব্বেন আবার কি? একটু বসে যাবেন। নেন, বসুন দেখি ঐ চেয়ার খানাতে। হাঁ, বসুন, বসুন।

ঈশানবাবু এক রকম জোর করেই ধীরেনকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দিয়ে, অমিতার দিকে ফিরে বললেন : নাও অমিতা, এক কাপ্ চা আর দুটো সন্দেশ এনে দাও দেখি! যাও, শীগ্‌গীর যাও। তোমার বাপের বাড়ীর লোককে তুমি যত্ন করতে শেখোনি?

অমিতা কিছু না ব'লে ঘর থেকে চলে গেলো। সে এতক্ষণে

বিরক্তির হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেয়ে গেছে। তার মুখখানা প্রসন্ন নয় বটে, কিন্তু অপ্রসন্নতার কালিমা আর সেখানে ঢালা নেই।

অমিতা চলে গেলে ঈশানবাবু আরম্ভ করলেন: দেখুন ধীরেন-বাবু? আমার শরীরটা কিছুদিন হ'ল বড় খারাপ যাচ্চে। সেজন্যে অমিতা কিবা দিন, কিবা রাত্রি, আমার সেবায় লেগে আছেন। এক একটা স্ত্রীলোক থাকে জানেন তো, রোগ পেলে তার নাক মুখ ছিঁড়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। রুগীকে সেবার চোটে তাকে শারীরিক রোগ-মুক্ত করে বটে; কিন্তু নিজের মানসিক রোগ এনে ফেলে। অমিতার ঠিক সেই রোগ এসে দাঁড়িয়েছে। আমার অসুখ এখন বেশী কিছু নেই; কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে ওঁর সেবা ডবল প্রমোশন পেয়েছে। আর ডবল প্রমোশন পেলেই, ছাত্রদের মাথা খারাপ হয়ে যায় জানেন তো? ওরও সেই কারণে একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখুন না; আপনি এলেন কোথায় আপনাকে অভ্যর্থনা করে'—

ধীরেন বাধা দিয়ে বল্লে: যাক্, ও কথা ছেড়ে দিন। আমি সেজন্যে কিছু মনে করিনি। আর তা ছাড়া—,

ঈশানবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: মনে কিছু করেননি তো? আঃ বাঁচা গেল! কিন্তু মনে করলেও করতে পারতেন, কেননা তার কারণ যথেষ্ট ছিল। যাক; এখন একটি কথা আপনাকে বলবো।

ধীরেন ঘাড় বেঁকিয়ে বললে: বলুন।

ঈশানবাবু এবার দরজার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন; দেখুন ধীরেনবাবু, আমার রোগ যা হয়েছে তাতে ডাক্তারেরা বলে কি জানেন? তারা বলে, একবার কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া খেয়ে এলেই, আমার অসুখ একেবারে শেকড় থেকে সেরে যাবে। ওষুধপত্রে না কি এ রোগে ততো কাজ করে না। সেটা আমিও

কতক কতক বুঝতে পাচ্চি। এই দেখুন না; এই তিন মাস ধরে, হেন ওষুধ নেই যা আমার এই পোষ্টাফিসে না ঢুকেছে, তবু সেই একটু জ্বর, সেই একটু কাশি, যেন মৌরশি পাট্টা নিয়ে বসে আছে। ইন্‌জেকসন যে কতো করলুম, তার তো ইয়ত্তা নেই। তবু রোগ বলেন, আমি এতেও সবটা যাচ্চিনে। এই সব দেখে শুনে, সব ডাক্তারই বলচেন, একবার হাওয়া বদলে আসতে।

এতক্ষণ ঈশানবাবু ব'কে যাচ্ছিলেন, এবার ধীরেন বল্লে : আমারও তাই মনে হয়। আপনি একবার যদি মধুপুর কি সিমুলতলা ঘুরে আসেন তা হলে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে আসবেন।

ঈশানবাবু বললেন : হাঁ, নতুন মানুষ হবার জন্যেই উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন, টাকার দরকার। হাতে সব আছে, কেবল ঐ জিনিষটাই নেই। সেজন্যে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব যেখানে যে আছে, সকলের কাছেই হাত পেতেচি, অথচ এমনি দুঃসময় যে, সকলেই দেবো বলে আর দেখা করেন না। শ্বশুরবাড়ীতেও চিঠি লিখেচি, কিন্তু শ্বশুরমশাইতো নেই, থাকলে আমাকে কিছুই ভাবতে হোতো না। তিনি মারা যাবার পর সম্বন্ধীরা আর বড়ো খোঁজ খবর নেন না। সস্মিতকে একখানা চিঠি লিখেচি, অনেকদিন হয়ে গেল তার; কোনো উত্তর পাচ্চি না। উত্তর বোধ হয় আর পাবো না। তাই বড়ো ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়িয়েচে।

এতদূর পর্য্যন্ত ব'লে ঈশানবাবু ধীরেনবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু ধীরেনের মুখে কোনো ছাপ পড়লো বলে মনে হল না। সে উত্তর দিল :—আচ্ছা, সস্মিতবাবুকে আমি একবার বলবো'খুনি, যাতে আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য করে। তবে কি জানেন, সে নিজে তো বিশেষ কিছু রোজগার করতে পারে না, তেমন পসার তার এখনও

হয় নি, ঐ পৈত্রিক পুঁজি থেকেই তাকে সংসার চালাতে হয়। আর তার বাপতো বেশী কিছু রেখে যেতে পারেন নি।

ঈশানবাবু বললেন: না, তা পারেন নি। কাজেই মনে হয় সম্মিতের কাছ থেকে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি, দয়া করে,—অবিশ্যি জোর ক'রে কিছু বলতে পারি না',—তবে, একখানা হ্যাণ্ডনোট আমি নিশ্চয়ই লিখে দেবো,- আপনি যদি,—

"আমি?" ধীরেন চোখটা নামিয়ে বললে: টাকা দেওয়াতে এখন মুস্কিল হবে ঈশানবাবু! আমার টাকাগুলো এখন এক জায়গা আটকে পড়ে আছে! অর্থাৎ যে লোকটা নিয়েছে, সে লোকটা—

একটু ঠুংঠুং করে শব্দ হতেই ধীরেন দরজার দিকে চেয়ে দেখলো, অমিতা তার ভরা যৌবনের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে, একহাতে এক কাপ চা ও অন্য হাতে একখানি রেকাবি বহন করে ঘরে ঢুকচে অমিতার মুখখানি তখন শরৎকালের প্রভাতের মত স্থির ও স্নিগ্ধ করোজ্জল। কপালের উপরে একগুচ্ছ চুল চক্রাকারে পড়ে রয়েছে, মাথার কাপড় খানি সিঁথির ওপর ঢেউ খেলিয়ে যেন কত আদরে কপালটিকে ঘিরে রয়েছে। কাপড়ের আড়াল থেকে দুই কানের দুটি দুল নেচে নেচে গাল দুটির উপর আপনাদের প্রভা বিস্তার করবার প্রয়াস পাচ্ছে। ধীরেন দেখে চম্‌কে উঠলো রূপের উপলব্ধিতে কি নিজের সম্ভোগ-নিঃস্বতার হতাশায়, তা বুঝে উঠা কঠিন।

অমিতা চৌকির উপর চায়ের কাপ ও মিষ্টান্নের রেকাবি খানি রেখে পাশে এসে দাঁড়ালো একেবারে উদাসীন আজ্ঞাবাহীর মতো। ধীরেন একটা কিছু না বলে থাকতে পারলো না। সে ব'লে উঠলো: কেন অমিতা তুমি এই কষ্টটা করলে? আমার এখন খাবার দাবার কোন আগ্রহ নেই!

মাঝে থেকে ঈশানবাবু বললেন, 'তা হোক, তা হোক, একটু কিছু মুখে দেন। আপনাকে এক কাপ চা করে দেওয়া, এ আর পরিশ্রম কি ? নেন, সন্দেশ একটা মুখে দেন দেখি!' ব'লে রেকাবি খানা হাতে করে ধরে ঈশানবাবু একটা সন্দেশ ধীরেনবাবুর মুখে গুজে দিতে গেলেন।

কাজেই ধীরেন সেটাকে মুখের মধ্যে না নিয়ে থাকতে পারলো না। একটা যখন শেষ হলো তখন আর একটা সন্দেশ ঈশানবাবু হাতে ক'রে দিতে যান দেখে, ধীরেন তাড়াতাড়ি নিজ হাতে রেকাবি থেকে খেতে আরম্ভ করলে। রেকাবির জিনিষ শেষ হ'লে সে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে মুখের কাছে ধরলো।

ঈশানবাবু ইত্যবসরে অমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন : বুঝলে অমিতা, ধীরেনবাবুকে টাকার কথা বললুম। উনি এখনও কিছু উত্তর দেন নি, কিন্তু বোধ হয় আশাপ্রদ উত্তরই দেবেন।...আর টাকা না হলে আমাদের তো চলবে না! তুমি তো সব গয়নাগুলোও বাঁধা দিয়ে বসে আছো। বাকী আছে ওই কাণের দুল দু'টো।...সে দু'টো বিক্রি করলে ট্রেনে যাওয়ার কুলি ভাড়াও বোধহয় কুলোবে না! আফিস থেকেও যে কিছু ধার নেবো তার রাস্তাও তো আগে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ধীরেনবাবুর কাছে একখানা হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে ? কি বলো ?

অমিতা এতক্ষণ চিত্রার্পিত-পুত্তলিবৎ দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর কথায় তাকে মুখ খুলতে হোলো। সে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের উপর ডান হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বললেঃ-টাকা আমাদের খুবই দরকার, তা সত্যি। আর, ধার করতে হবে সে কথাও সত্যি! কিন্তু তা বলে ধীরেনবাবুকে এর ভেতরে টেনে আনা

কেন ? উনি হয়তো এজন্যে কতো অসুবিধায় পড়বেন. তারই বা ঠিক কি ?

ঈশানবাবু সামলে নিয়ে বললেন: না, অসুবিধা হয় তো আমি টাকা ধার দিতে বলি না। তবে ধীরেনবাবু তোমার ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু,—আর তোমাকেও ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচেন,—তাই ওঁর কাছে এ কথাটা পাড়লুম। আমাদের বিপদের সময়, আমাদের পরিচিত লোক চারিধারে যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি সাহায্য না করেন, তা হ'লে আর কাদের কাছে দাঁড়াবো ?

অমিতা তবু জিনিষটার ওপর প্রসন্ন হতে পারলে না; সে তেমনি মাথা নামো ক'রে, নখ খুঁটতে খুঁটতে আপত্তি জানাতে লাগলো। —"উনি তো আমাদের সঙ্গে বড়ো মেলামেশা করেন না। আর তোমার সঙ্গেও তেমন পরিচয় নেই। তবে ওঁকে এর জন্যে অনুরোধ করা আমার বোধ হয় আমাদের সঙ্গত হবে না"

ঈশানবাবু বললেন: আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ না থাকলেও, তোমাকে ত উনি অনেক দিন থেকেই চেনেন। বিশেষ তোমার ভাইয়ের মুখে শুনেছি, ছেলে বেলায় তোমরা দুজনে পরস্পর বন্ধু ছিলে। সেই বন্ধুত্বের জোরে কিছু টাকা ধার দেওয়া বোধ হয় ওঁর অসঙ্গত হবে না !

অমিতা তবু মত দিতে চায় না। বললে; "জিনিষটা তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারচো না! আমাদের যে কতো নীচু হতে হবে"—

যে যাকে কখনও অনুগ্রহ করে নি, সে নিজে যদি তার কাছ থেকেই অনুগ্রহ চায়, তাহলে সেটা স্রোতের মুখ যে কোন্ দিকে ফিরিয়ে দেয়, তা সব সময়ে ঠিক থাকে না। ধীরেন বরাবরই খোঁজে,

কিসে অমিতাকে কোনও রকমে তার প্রতি অনুকূল কর্বে; বিফল সে বরাবরই হয়ে এসেছে। কাজেই আজকে অমিতাকে সাহায্য দিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ করতে ধীরেন একটা মুক্ত সুযোগ দেখতে পেলে। সে যখন দেখলে, এ সুযোগের দ্বার অমিতাই বন্ধ করে দিতে চায়,—ধীরেনের উপকারটুকু নিয়ে সে তাকে আরও নিকটবর্ত্তী হতে দিতে ভয় পাচ্চে,—তখন চিরমুগ্ধ যুবক সজোরে তার সুযোগটুকু আক্রমণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠলো,—খুব আগ্রহসহকারে বলে বসলো: অমিতা? তুমি এমন 'কিন্তু কিন্তু' কচ্চ কেন? আমার কাছে কোনও রকম সাহায্য নিলে যে তোমরা আমার চোখে নামো হয়ে যাবে, এ ধারণাটা তোমার কোথা থেকে হলো?

অমিতা আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষা কর্ত্তে জোর করে বললে: এ ধারণাটা হওয়া খুবই সহজ! সকলেরই তা হতে পারে। টাকা ধার নিতে গেলে অপরের কাছে যে খাটো হতে হয়, সেটা আপনি বুঝবেন না ধীরেনবাবু, কেননা সে দুর্ভাগ্যের হাত থেকে ভগবান আপনাকে চিরকালই দূরে রেখেছেন, কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে দুবেলাই আবরণ করে যাদের নিতে হয়, তারা সেটা বেশ বুঝতে পারে। আমাদের কখনও ঋণ করবার হীনতা স্বীকার করতে হয় নি; কিন্তু আজ আর সে গোমর করা চলচে না। আমার স্বামীর অসুখের জন্যে অনেক কিছুই আজ আমাকে ছাড়তে হবে!

ধীরেন অমিতার দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে, পরে বললে: অমিতা? তুমি আপনাকে বরাবরই সকলের উঁচুতে রেখে দাও। এটা তোমার গুণ কি দোষ, তা জানি না। কিন্তু একদিন যে আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশ,—ওর নাম কি,—একটা জানাশুনো, একটা সৌহার্দ্দ ছিল, সেটার জন্যে আমি যদি তোমার কিছু উপকার করতে যাই,

তাতে তোমার বাধা দান করা বোধ হয় তোমার অন্যায়ই হয়ে দাঁড়াচ্চে, অমিতা!

স্বামীর প্রতি একবার চাহিবামাত্রই অমিতা বুঝলে, এঁর কাছে টাকা নিতে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ! তখন অমিতা আর কোনও কথা কওয়া উচিত বলে বিবেচনা করলে না; সে শুধু মুখ নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঘর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধই গেল; তারপর ধীরেন সহসা বলে উঠলো: এ টাকা আপনাকে নিতেই হবে ঈশানবাবু? আমি কাল সকালেই আপাততঃ এক হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি! পরে দরকার হয়, আরও দেবো! আপনি পরশুই হাওয়া বদলাতে বেরিয়ে পড়ুন। বলেন তো, আমি একখানা বাড়ীও সিমুলতলাতে ঠিক করে দিতে পারি।

ঈশানবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠে বললেন: কি আনন্দ যে আজ হ'ল ধীরেনবাবু, তা আর আপনাকে কথায় বলে উঠতে পাচ্চি নে। অমিতার সৌভাগ্য যে, সে একদিন আপনার স্নেহের পাত্রী ছিল।

ধীরেন উৎসাহের আতিশয্যে বলে ফেললে: সৌভাগ্য কি অভাগ্যের কথা নয় ঈশানবাবু! আপনাদের সাহায্য করতে পেলে আমি গর্ব্ব বলেই মনে করবো। তাহলে এখন আসি; কাল ঠিক এমনি সময় টাকাটা নিয়ে এসে হাজির করবো।

একটা নমস্কার করে ধীরেন যাবার জন্যে পা বাড়ালে। অমিতা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিল। অমিতা কিন্তু চোখ তুললে না; সে যেমন নতনেত্রে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই রইলো। তবু ধীরেন অনুভব করলে, তার মুখখানা কুয়াশা-

চ্ছন্ন দিনের মতো কালো হয়ে রয়েছে। ঐ কুয়াসার আড়ালে একটা গভীর মর্ম্মবেদনা যেন আপনার বুক চেপে ধরে নিঃশ্বাস নিচ্চে। সেখানে যেন হাওয়া নেই, শুধু গুমোট। সেখানে জীবন, মৃত্যুর একটা সম্মোহন মন্ত্রে অসাড় হয়ে আছে। অপমান মানুষকে সঙ্কুচিত করে বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী করে অপমানের ভয়।...শরীরী বস্তুর চেয়ে ভূতই মানুষকে দমিয়ে দেয় বেশী।

(৮)

ধীরেনবাবু চলে গেল, কিন্তু অমিতা তারপরে আর গৃহস্থালী কাজে মন দিতে পারলে না। সে যতো কোনও কাজ করতে যায়, ততই একটা চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। টাকা ধার? ধীরেনের কাছে? যে ধীরেনকে সে একদিন ঐকান্তিক আগ্রহের ওপরেও অপমান করেছে, তার কাকুতি-মিনতি হাতে ঠেলে তার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেছে,—আজ সেই ধীরেনের কাছে এত বড়ো সাহায্য যেচে নিতে হচ্চে! ধীরেন অবশ্য সহৃদয়তা দেখিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নামো করে দিয়ে গেল তাদের! এটা কি না করলেই নয়? ঋণ করতেই হবে? এবং তারই কাছে?

সমস্ত রাত্রি অমিতা ভাল ক'রে ঘুমুতে পারলে না। কেবলই ভাবতে লাগলো ঐ সব কথা!

সকাল বেলায়, ঈশানবাবুকে মুখ ধোওয়াতে এসে সে বললে: হাঁগা, টাকাটা কি নিতেই হবে? না নিলেই নয়?

ঈশানবাবু বললেন: তুমি কোনটা বেশী দামী ব'লে বিবেচনা করো? টাকা ধারের অপমান না আমার জীবন?

অমিতা প্রত্যুত্তরে বললে : ও রকম মর্ম্মান্তিক প্রশ্ন করলে আমাকে চুপ করে থাকতেই হবে। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি আমরা কি ক'রে টাকাটা শোধ করবো ?

ঈশানবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন : কিন্তু মানুষের জীবনটা কি ভগবানের কাছে একটা ঋণ নেওয়া নয় ? তাঁর ঋণও তো এক রকম করে শুধতে হবে।

—তাঁর ঋণ শোধ হয় তাঁর কাজে। কিন্তু এ ঋণ তো শোধ করতে হবে টাকায়।

—ভগবানের জিম্মা জিনিষটা যদি বজায় রাখতে পারি, তাহ'লে পৃথিবীতে ছড়িয়ে-দেওয়া তাঁর টাকা রোজগার করতে ক'দিন লাগে ?

কিন্তু এর চেয়ে একটা ভয়ঙ্কর বিপরীত দিক্ আছে, ঈশানবাবু বাঁচবার প্রলোভনে সেটা আর মনে আনতে পারলেন না। অমিতার মনে ছাঁৎ করে সে সন্দেহটা এলো, কিন্তু এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকল্পটা সে আর মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

কথাটা তখনকার মতো ঐখানেই চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু দুপুরবেলায় হঠাৎ আবার অমিতার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। সে এসে বললে : ওগো, ঘণ্টা তিন চারেক ছুটি দাও। আমি একবার ভবানীপুর গিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করে আসি, তিনি কোনও রকমে টাকাটা ধার দিতে পারেন কি না। আমরা তাঁর চিঠির উত্তর পাইনি বলেই যে তিনি টাকাটা ধার দেবেন না, এটাই বা কি ক'রে প্রমাণ হয় ?

—মনের বিশ্বাসের মূলে সব সময় সব প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না, এটা মানো তো ?

কিন্তু এটাও মানি, মনের বিশ্বাস সব সময় বাস্তবে এসে পৌঁছোয় না। তার চলাফেরা বড়ো সঙ্কীর্ণ-পথের ওপর দিয়ে। সে পথ হারালেই, নিজেও হারিয়ে যায়।

—তবে দেখো।"

—হাঁ, তুমি রাগ কোরো না; আমি শীগ্‌গির ফিরে আসবো।

—কিন্তু ফিরে আসবার সময় তুমি চোখেও দেখতে পাবে না, কাণেও শুনতে পাবে না, তাও বলে দিচ্ছি। দাদার কাছে যেচে অপমান খাওয়া, সেটা কতোটা তোমায় সোজা রাখতে পারবে, ভেবে দেখো।

—আচ্ছা, গিয়ে একবার দেখি না।

অমিতা তখনই তার ছোকরা চাকরকে ডেকে হুকুম দিলে, 'ওরে একখানা ভাড়া গাড়ী ডেকে আন্‌তো। বলবি ভবানীপুর যাবে আসবে। সেখানে বেশী দেরী হবে না। যা শীগগির যা, আর দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে।'

চাকর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এদিকে অমিতা তার কাপড়খানা ছেড়ে নিয়ে একখানা ফরসা-দেখে কাপড় প'রে নিল; আর একটা ফরসা সামিজ কাপড়ের ভেতরে এঁটে নিল। যখন সে শাড়ির ওপরে গায়ে একখানা শাল চারপাট করে নিলে, তখন চাকর বাহির থেকে ডাকলে: মা, গাড়ী এসেচে।

হঠাৎ অমিতার কি হলো; সে বলে বস্‌লো: না রে, আর যাওয়া হবে না। তুই গাড়িখানা ফিরিয়ে দে। এই দু'গণ্ডা পয়সা বখশিষ দিয়ে তুই গাড়োয়ানকে বিদেয় করে দে।

চাকরটি কি করে, মায়ের হুকুম! কাজেই গজ্ গজ্ করতে

করতে গাড়ী ফেরাতে গেল। এদিকে ঈশানবাবু উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি, বাপের বাড়ী গেলে না যে?

না, থাক্‌গে।

কেন, থাকবে কেন? এই বললে, দাদার কাছে হয়তো টাকা পাওয়া যেতে পারে,—

তুমি কি আমায় পাগল করবে? ওগো, তোমার পায়ে ধরি, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না।

বল্‌তে বল্‌তে অমিতা কেঁদে ফেললে। ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না, অমিতা কাঁদলো কেন?

কিন্তু যে অপমানের ভয় অমিতার উৎসাহকে সজোরে নিবিয়ে দিয়েছিল, সেটা হাজারটা ছুরি বার ক'রে তার বুকখানাকে কেটে কেটে শত খণ্ড করতে লাগলো; এবং দিনের বাকি সময়টা অমিতা কিছুতেই স্থির হতে পারছিল না।

সন্ধ্যা তখনও ঠিক হয় নাই। সূর্য্যের আলো নগরের প্রা...গুলোর মাথায় একেবারে চিল ছাদের ওপর, তখনও আটকে ছিল।

অমিতা অতি কষ্টে তার কাপড় কাচা সেরে সবে ঈশানবাবুর কাছে এসে বসেচে, এমন সময় বাহির থেকে কে কড়া নাড়লে।

ঈশানবাবু তাঁর রোগ-কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কে ও?

উত্তর এলো: আমি ধীরেন।

—আসুন, আসুন। ওরে ঝি, দরজাটা খুলে দে।

ঝি দরজা খুলে দিতেই, ধীরেন লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকে এসে বললে: এই নেন আপনাদের টাকা। এই থলির মধ্যে ঠিক এক হাজার টাকা গুণতিতে আছে।...হ্যাঁ; পশ্চিমে বাড়ী যোগাড়

হয়েছে ?···হয়নি ?···যদি বাড়ী চান, তারও ব্যবস্থা করে এসেছি। এই চাব নিয়ে কালই রওনা হয়ে পড়ুন। সিমুলতলায় একখানা বাংলো !

ঈশানবাবু আনন্দের উদ্দামে একেবারে বিছানায় উঠে বসে বললেন: আজ যে উপকার আপনি আমার করলেন, তা জীবনে ভুলবো না।

ধীরেন সহাস্যমুখে বললে: কিন্তু অমিতা ভুলে যাবে, কি বলো অমিতা ?

অমিতার মুখখানা একেই তো সঙ্কুচিত হয়েছিল, এই পরিহাসের তুষার-বৃষ্টিতে আরও যেন কি রকম হয়ে গেল। সে কোনও উত্তর তো দিলেই না, বরং মুখ ফিরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে পাশের বাড়ীর দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলো।

ঈশানবাবু সামলে নিয়ে বললেন: অমিতাও ভুলবে না, আমি এটা লিখে দিতে পারি।

ধীরেন বললে: আপনি কি লিখে দিতে পারেন না পারেন, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করচিনে। আমি শুধু বলচি, অমিতা এটা পছন্দ করে না বলে, বেমালুম হজম করবে। তা করুক, অমিতাকে আমি বরাবরই জানি,ও চিরদিনই আমার ওপর নির্দ্দয়। এ নির্দ্দয়তাটা কিন্তু একেবারেই অপাত্রে পড়চে, তা বলে দিচ্চি অমিতা !

অমিতা তবু কোনও কথা কইলো না, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়েই রইলো। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে মেশা একটা রঙয়ের ঢেউ তার মুখের ওপর খেলা করতে লাগলো।

ধীরেন অমিতার ঔদাসীন্য দেখে একটু নরম হয়ে গেল; খানিকটা

অতি অসভ্য এবং অভদ্র কাজের জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ কচ্চি। এটা শুধু অমার এ্যাটরনীর জন্যেই কর্ত্তে হচ্চে। এ্যাটর্নীরা জানেন তো ভয়ানক সন্দেহী লোক, ভয়ানক। তারা পকেটে কাগজ থাকলে, দশবার করে তুলে দেখে কাগজখানা আছে কি না। আপনার স্ত্রীকে টাকা দিয়ে, তাঁর কাছ থেকে টাকার রসিদ লিখিয়ে নেয়; এই রকম ধরণের লোকের পাল্লায় পড়ে, আপনাকে আমার অনুরোধ করতে হচ্চে,—এই টাকাটার জন্যে আপনি শুধু একখানা হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিন। আমি এ্যাটর্ণীকে বললুম, এ কাজটা অতি গর্হিত হচ্ছে, তবু তিনি কিছুতেই আমায় ছাড়লেন না।

ঈশানবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: সে কি কথা! গর্হিত কেন হতে যাবে, ধীরেনবাবু? এ তো আমার কর্ত্তব্য কার্য। আমি তো কালই আপনাকে বলেছিলুম যে, একখানা হ্যাণ্ডনোটে আমি টাকাটা ধার নিতে চাই। নিশ্চয়ই লিখে দেবো, একি কথা!

ধীরেন তখন পকেট হতে একখানা লেখা কাগজ বার ক'রে বললে: হাঁ, কেলেঙ্কারি দেখুন না। আবার হ্যাণ্ডনোট! যাহ'ক, এই কাগজখানাতে সই করে দেন। এ্যাটর্ণী যখন ধরেছে, তখন তো ছাড়বে না, আর এ্যাটর্ণীর হাতেই আমার সব। এ টাকাটা আজ তার হাত থেকে নিয়ে আসতে হোল, তাইতেই তো এতো দেরী হ'ল।...হাঁ, এইখানে এই ষ্ট্যাম্প্‌টার ওপরে সই করুন।

ধীরেন কাগজখানা খুলে ঈশানবাবুর সন্মুখে ধরলে, এবং পকেট থেকে ষ্টাইলো কলমটা বার করেও তাঁর হাতে দিলে। ঈশানবাবু নিরতিশয় আগ্রহে কাগজখানার কিছু না পড়েই, তার ওপর সহি করে দিলেন।

অমিতা একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে তারপর আবার তখনই মুখ অন্যদিকে ক'রে নিলো। তার মনে হলো, সে যেন সিঁড়ির ওপর-ধাপে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ পা-হড়কে নীচে পড়ে গেল ! মাথাটাও বুঝি একটু-ঘুরতে লাগলো।

সহি হয়ে গেলে, ধীরেন হ্যাণ্ডনোটখানা বেশ ক'রে মুড়ে, কোটের বুক পকেটের ভিতর রাখতে ভুললো না। কিন্তু মুখে সে বলতে লাগলো : এই কাগজখানা আপনাকে দিয়ে সই করাতে আমার যেন মাথা-কাটা যাচ্ছিল। কিন্তু কি করি ? এ্যাটর্ণীর হুকুম ! তা না হ'লে আপনার সুমুখেই কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলে দিতুম। তা যাক্ ! এখন কবে যাচ্ছেন তা বলুন।...হাঁ অমিতা, কালকেই তোমরা বেরিয়ে পড়ো না কেন ?

যার মুখের কথাটি শোনবার জন্যে ধীরেন এই প্রস্তাবটা করলে, সে তখনও নিস্পন্দ ভাবে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে। প্রস্তাব শুনেও সে, হাঁ, না কিছু বললে না; কিছু বলবে বলেও বোধ হ'ল না। সে যেন কিছু শুনতেই পায় নি।

ঈশানবাবু বললেন : সিমুলতলায় বাড়ী ঠিক করেছেন, বলচেন ? তাই যাই ! জায়গাটা মন্দ নয়। শরীর সারবার পক্ষে জায়গাটার বেশ সুনাম আছে !

ধীরেন বললে : ওঃ ! চমৎকার জায়গা। আমার এক বন্ধু মাঝে মাঝে সেখানে যান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ! তাঁর স্ত্রীরও ঐ রকম মাঝে মাঝে একগুঁয়ে জ্বর হয়। কিন্তু তিনি বলেন, সেখানে গেলেই জ্বর যেন সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা খেয়ে পালায়। অতি সুন্দর জায়গা ! আর দোনো-মনো কর্ব্বেন না। অমিতা ? তুমি কি বলো, সিমুলতলা জায়গা ভাল নয় ?

কে যেন একজন পাশের ঘর থেকে অমিতার গলায় উত্তর দিলে: ভালো।

তুমি কখনও সেখানে গেছো?

না।

তবে যাও। একবার দেখে এসো। গেলে আর তুমি ভুলতে পারবে না! লোকের বাগান বাড়ীতে কতো গোলাপ ফুলের গাছ! আর কি বড়ো বড়ো গোলাপ ফুল। মনে হয় যেন পারস্য দেশটা কোনও প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছে এই নির্জ্জন ভূখণ্ডে! অমিতা? আমি তোমায় বিশেষ করে অনুরোধ কচ্চি, তুমি ঈশানবাবুকে নিয়ে একবার সেখানে যাও।

'আপনার অনুরোধ শিরোধার্য্য' ব'লে কি একটা অভিমানভরে অমিতা জানলা ছেড়ে সে ঘর থেকে বাহিরে চলে গেল।

ঈশানবাবু পেছন থেকে বললেন: তুমি চলে যাচ্চ অমিতা, ধীরেন বাবুর জন্যে এককাপ চা আর কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিও।

অমিতা বাহিরের থেকেই উত্তর দিলে: আচ্ছা।

অমিতার ঔদাসীন্যে, বিশেষ শেষের ঐ উক্তিটাতে ধীরেনের মন চমকে উঠলো একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতে। সে মনে মনে অনেক আশাই করে এসেছিলো, অমিতার কাছে নিজের একটা বিরাট মহত্বের পরিচয় দিবার জন্যে সে কতো না ষড়যন্ত্র মনে মনে এঁটেছিলো, কিন্তু ব্যপার দেখে সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠলো। তার মনে হোলো, সে বুঝি একেবারেই ধরা পড়ে গেছে, তার মহত্বের মধ্যে যতটা ছলনা ছিল' সবটাই বুঝি অমিতা দূরবীন দিয়ে দেখে ফেলেছে। কিন্তু উপায় কি? যাতে অমিতার দুষ্ট চক্ষুতে সে এখনও মহত্বের

ছবি অঙ্কিত করে দিতে পারে, সেই দিকেই তো চেষ্টা করতে হবে! ধীরেন দমলো না, বরং আরও সুযোগ সন্ধান করতে লাগলো, তার বিষয়ে অমিতার তুচ্ছতা যাতে ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ঈশানবাবু টাকাগুলো পেয়ে একেবারে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; তিনি ধীরেনকে যতো কথা বললেন, তার চেয়ে বেশী দিলেন আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু এতগুলো ধন্যবাদেও ধীরেনের ক্ষুধিত মন তৃপ্ত হ'ল না, বরং আরও ক্ষুধার জ্বালায় খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

দুজনের এর পরে যা কথাবার্ত্তা হোলো, তাতে একদিকে বক্তা ছিল একজন তৃপ্ত পূর্ণভুক্ত অনাথ, আর একদিকে অতৃপ্ত, ক্ষুধিত দাতা। কাজেই কথার বিনিময় বড়ো রসের আস্বাদন আনতে পারলো না যতক্ষণ না অমিতা এক পেয়ালা চা ও এক রেকাবি খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। ধীরেন অমিতাকে দেখেই বলে উঠলো: আতিথ্য বুঝে দিতে অমিতা যতোটা প্রস্তুত, অতিথিকে বুঝে নিতে ততোটা প্রস্তুত নয়। অমিতা চিরকালই আমার কাছে একটা সমস্যা রয়ে গেল।

কথাটা ছিটকে গিয়ে অমিতার বুকে লাগলো, কিন্তু তবু সে চুপ করেই সহ্য করলে। খাবার ও চা রেখে সে আবার ত্বরিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ধীরেন বুঝে উঠতে পারলে না, কেন অমিতা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চে। এতো বড়ো উদার উপকারের পরেও সে যে একটু হৃদয়ের ছোঁয়াচ দিল না, এজন্যে মনে তার মেঘও যতো জমলো, ঝড়ও ততো বইতে লাগলো। ঈশানবাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে চা এবং খাবারে সে আতিথ্যের সম্মান রক্ষা করলে বটে, কিন্তু নিজের মনের সম্মান সে রক্ষা করলে না।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সে জোর করে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

(১০)

হাতে টাকা পড়াতে, এবং সিমুলতলার বাড়ী ঠিক হয়ে যাওয়াতে, ঈশানবাবু একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বেরিয়ে পড়তে। ধীরেন যেদিন টাকা ও চাবি দিয়ে গেল, তার পর দিন সকালে উঠেই তিনি অমিতাকে বললেন: অমিতা, আর আমাকে গলা টিপে এই রোগের রাজত্বের মধ্যে রেখো না। আজই চলো সিমুলতলা যাই।

' আজই ?

হাঁ আজই। এত ক'রে যোগাড়যন্ত্র ক'রে আর একদিনও অপব্যয় করা চলবে না।

অমিতা হাঁ না কিছু বললে না। কাল থেকেই তার মনের জোর এত কমে গেছে যে, সে যে একটা অভিমত দেবে, সেটুকু সাধ্যও আজ তার নেই।

ঈশানবাবুর তাড়ায় পুঁটলি-পাঁটলা বাঁধা সুরু হল। অমিতা সব জিনিষই গুছিয়ে নিতে লাগলো, কিন্তু তবু তার মধ্যেও সে কেমন উৎসাহের অভাব অনুভব করতে লাগলো।

একটু বেলায় ধীরেনবাবু এসে দেখা দিল। সে এসে এদের যাবার যোগাড় দেখে মহা আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো।

—অমিতা, সঙ্গে থার্ম্মোমিটারটা নিতে ভুলো না।

অমিতা কোনও উত্তর দিল না, অন্য কাজে চলে গেল।

—অমিতা, একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ করে দেবো? তা না হ'লে তুমি রুগী নিয়ে যাবে কি করে?

অমিতা উত্তর দিল: মুটে জানে সে কেমন ক'রে মোট বইবে। এখানে অপরের উপদেশ দিতে যাওয়া চলে না।

—দ্যাখো, কিছু খাবার বাড়ীতে তৈরী করে সঙ্গে নাও। ষ্টেশনের খাবারগুলো কিনে খেও না। ওগুলো বিষ।

'আমি জানি'। ব'লে অমিতা ফর্কে কর্ম্মান্তরে চলে গেল।

যাবার সময়, ধীরেন হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে গেল, তাদের টিকিট কিনে দিলে, তাদের গাড়ীর মধ্যে জায়গা করে বসিয়ে দিলে ঈশানবাবু অনেক ধন্যবাদ বর্ষণ করলেন, কিন্তু যে মুখ থেকে অল্প একটু ধন্যবাদের শিশির-জল ধীরেন খুঁজছিলো, সেটুকু সে কিছুতেই পেলে না।

যখন গাড়ি ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়লো, তখন ধীরেন বললে: তোমরা পেঁ'ছেই একখানা চিঠি দিও, অমিতা।

অমিতা ধীরেনের দিকে চেয়ে বললে: আচ্ছা।

—আর যখনই টাকার অকুলান পড়বে, তখনই আমাকে লিখে পাঠিও।

অমিতা এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে প্লাটফরমে লোক-চলাচল দেখতে মনোনিবেশ করলে। ধীরেনবাবু আওড়াতে লাগলো:

তোমাদের জন্যে আমি বিশেষ চিন্তিত রইলুম, বুঝলে?

গোটাকতক পান কিনে দেবো নাকি? শুনচো?

তাহ'লে আসি অমিতা। ইঞ্জিনে বাঁশী দিল।

নমস্কার ঈশানবাবু। অমিতা, চললুম।

গাড়ি একটু একটু ক'রে চলতে আরম্ভ করলো। ধীরেন কামরা থেকে লাফিয়ে প্লাটফরমে নামলো। অমিতার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। ধীরেনের চোখে হাঁসি ফুটে উঠলো, কিন্তু অমিতার ?

সে পাষাণ, তবু কি সুন্দর !

ধীরেন পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে বিদায় অভিনন্দন জানাতে লাগলো। কিন্তু কাকে জানাবে ? অমিতা তার মুখখানি জানালা হতে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে। ঈশানবাবুও আগে থেকেই বেঞ্চতে শুয়ে পড়েছিলেন। কাজেই ধীরেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো তার রুমাল নেড়ে। সে তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে গুঁজে রাখলো।

গাড়ি যখন প্লাটফরম ছাড়িয়ে গেল, তখন ঈশানবাবু অমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ভদ্দরলোক দেখেছো ধীরেনবাবু ! এ রকম লোক আজকাল খুব কমই দেখা যায়।

অমিতা কোনও উত্তর দিল না। সে যেন কথাটা শুনতেই পায়নি।

ঈশানবাবু আবার বলতে লাগলেন : ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে ওঁর ছেলেবেলার ভাব ছিল, তা না হ'লে কে আমাদের টাকাটা দিত !

অমিতা তবু নিরুত্তর।

কথা কচ্চ না যে, অমিতা ?

কি কথা কইবো ?

ধীরেনবাবুকে তোমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে কচ্চে না ?

কচ্চে।

যে এত বড়ো উপকারটা করলে, সেই তো প্রকৃত বন্ধু। যদি তোমার কোনও আপনার জন থাকে অমিতা, তাহ'লে সে এই ধীরেনবাবু।

হবে।

তুমি এমন উদাসীন কেন অমিতা ?

নাঃ।

অকৃতজ্ঞ হয়ো না অমিতা। পৃথিবীতে অকৃতজ্ঞতার মত মহাপাপ আর নেই।

অমিতা কথাটা শুনে চমকে উঠলো। কিন্তু কিছু বললে না।

গাড়ি হুস্ হুস্ ক'রে চলতে লাগলো। ঈশানবাবু চিৎ হয়ে শুয়ে চুপ করে রইলেন। অমিতা তাঁর মাথার কাছে বসে জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকারে অস্পষ্ট গাছপালার ছায়া দেখতে লাগলো।

এঁরা সঙ্গে এনেছিলেন ঈশানবাবুর দূর সম্পর্কের এক ভাইকে। সে কলকাতাতেই থাকতো এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। দুপুর বেলা তাকে খবর দিয়ে আনান হয়।

সে কামরার আর এক ধারে একটা বেঞ্চিতে খানিকটা জায়গা দখল করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। সে বৌদিদির দিকে তাকিয়ে একবার বললেঃ বৌদিদি ? এই বেলা শোবার জায়গা যোগাড় করে খোকাকে নিয়ে শুয়ে পড়ো, নইলে এর পরে আর শুতে পাবে না।

খোকা একপাশে ঘুমুচ্ছিল।

অমিতা বললেঃ থাক্, পরে দেখা যাবে।

অনেক রাত্রে ঈশানবাবু বললেনঃ অমিত', তুমি কি মোটে শোবে না ?

অমিতা বললেঃ দেখি, যা হয় হবেখ্নি।

কিন্তু অমিতা মোটে শুতে চাইলো না। কি একটা ভাবনায় তার ঘুম একেবারেই চলে গিয়েছিল।

কামরায় আর একদল যাত্রী ছিল। একটি বৃদ্ধ, একটি তরুণী, আর একজন চসমাধারী যুবা পুরুষ। বৃদ্ধটি বোধ হয় ঘুমুচ্ছিল; আর তরুণীটি ঐ যুবা পুরুষটির সঙ্গে হেঁসে হেঁসে কথা কচ্ছিল।

আর মাঝে মাঝে হাঁসির চোটে তার গায়ের ওপরে একেবারে ঢলে ঢলে পড়ছিল। নারীপুরুষের এই নিলর্জ্জ অসামাজিকতা অমিতার চক্ষে যেন সূচ ফোটাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছু বলতে পরেনা, কেননা তারা রেলের যাত্রী। তারা পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে এসেছে, অমিতা বা অন্য কোনও যাত্রীর কাছে তাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, এমনি একটা ভাব তাদের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল।

অমিতা জেগে বসে আছে দেখে, তরুণীটি একসময় তার স্ফূর্ত্তির তোড়টা মুলতুবি রেখে অমিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা কোহনে যাচ্ছেন ?

সিমুলতলায়।

ও:। হাওয়া খেতে বুঝি ? আমরাও যাচ্ছি আরায়। ওনার বড় অসুখ কিনা! তাই।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলে: কি অসুখ ?

পক্ষাঘাত হয়েছে। তাই কোবরেজ বললেন একবার হাওয়া বদল করে আনেন।

ঐবুড়ো লোকটির বুঝি ?

হাঁ হাঁ, ওনার। আশী বচ্ছর বয়স হইচে, তবু বিয়া করতে ছাড়েন না। পক্ষাঘাত হবে নাতো কি ?

আপনার স্বামী ?

হাঁ। সাত পাকের ধন, এক রতন।

স্বামীর নামে এই মন্তব্য শুনে অমিতা তো অবাক্! তার মনে হ'লো,

হঠাৎ একটা নতুন পৃথিবীর খবর সে পে'লো। চেনা পুরাতন পৃথিবীটার সঙ্গে এর যোগ নেই। সে কৌতূহলী হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো:

আর, ওই বাবুটি আপনার কে?

উটি আমার ভগ্নিপোত। বড় ভাল। উনি টাকা দিচ্ছেন, তবে আমরা বেড়াতে যাচ্চি।

কেন, আপনার স্বামীর টাকা ছিল না?

থাকবে না ক্যান্? আমার এক সতান আছে, সে চাবকাটিটি কেড়ে নিয়েচে। তার ওপর উনি কথা কইতে পারেন না। কাজেই আমার ভগ্নীপতি টাকা কর্জ্জ দিলেন, তবে আসা হয়। নইলে আসাই হয়তো হতো না।

আপনার ভগ্নীপতিটি ত খুব ভাল?

খুব, খুব। অমন লোক দেখা যায় না। যেমান হাসি হাসি মুখ, তেমনি মন। আমার ভগ্নী মারা গেছেন, তবু আমাদের কতো খবর নেন, যত্ন করেন। ওঁর ভরসাতেই তো আমরা আরায় যাচ্চি।

অমিতা তারই মতো আর একটি ঘটনা চোখের ওপর দেখে বিস্মিত হ'ল। কিন্তু তবু সে অনুমোদন করতে পারলে না ঐ তরুণীর আচরণ। বৃদ্ধ স্বামীর এই এত বড়ো অসুখের সুমুখে ভগ্নীপতির সঙ্গে অমন হাঁসি-ঠাট্টা করে কথাবার্ত্তা কওয়া, সে পছন্দ করলে না। তার মনে হ'ল, তরুণীটি বোধ হয় ভদ্রতার বাইরে চলে গেছে।

এই সন্দেহ মনে উঠতেই অমিতা গম্ভীর হয়ে গেল। সে আর বেশী আলাপ করলে না।

গাড়ি চলেছেত চলেছেই। তার বিরাম নাই, বিরক্তি নাই, ভুল নাই। সে যেন পৃথিবীতে জন্মেছে শুধু চলতে, আর ছুটতে,-থামতে নয়। দার্শনিক

পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর সব জিনিষেরই এই অবস্থা। তবে তাদের সম-সাময়িক অনুভূতি থাকেনা, এই যা প্রভেদ। গাড়িতে চড়লে মানুষের এ অনুভূতিটা সহজেই আসে।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমিতা দেখছিল অন্ধকারের অস্পষ্ট পট ভূমিকায় গাছ পালা, পাহাড়, মাঠ সব কিছুই পেছন দিকে ছুটে পালাচ্ছে। তারা কিছু কথা কইছেনা, ইঙ্গিত কচ্ছেনা, শুধু পালাচ্ছে। যেন কার ভয়ে, তারা নীরবে, নির্ব্বাক্ হয়ে পলায়ন-রত। অমিতা বসে বসে কতো কি ভাবছিল, এই পলায়নটাও যেন তার কাছে একটা যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় ব'লে মনে হ'চ্ছল। মনে হচ্ছিল, সংসারে সকলেই দুঃখী, তারই মত দুঃখী অপমানিত। সেই অপমান ও দুঃখের কামড় ঝেড়ে ফেলবার জন্যই ঐ গাছ, পাহাড়, প্রান্তর সবাই দৌড় দিচ্ছে! তাদের পালাবার স্বাধীনতা আছে, পথ খোলা আছে, কিন্তু অমিতার?

না। অমিতার দৌড় দেবার পথ নাই, অধিকারও না। তার স্বামী অসুস্থ,—তাঁকে যে সারিয়ে তুলতে হবে! এযে ভগবানের আদেশ, চিত্তের নির্দেশ! চিত্তের ভিতর দিয়েই ভগবান মানুষের কাছে উদিত হন। —তবে স্বামীকে ফেলে পালাবে কি ক'রে অমিতা? তারপর, ঐ খোকা! ওযে নাড়ীর বন্ধন! সে বন্ধন কাটেই বা কি করে?

গাড়ীতে যতগুলি যাত্রী ছিল, তারা প্রায় সকলেই ঘুমুচ্ছিল। ঘুমুক না ঘুমুক, অধিকাংশ লোকই শয়ান। কেবল জেগে উঠে বসেছিল সে আর ঐ আরা-যাত্রী তরুণী আর তার ভগ্নিপতিটি। শেষোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে তার কেমন-একটা অনিচ্ছা বা ঘৃণার ছায়া তাকে আপন মনে চুপ ক'রে বসে থাকতেই প্রণোদিত করলো।

একবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো, পৃথিবীর সব জিনিষই ছুটে ছুটে পালাচ্ছে,—পালাচ্ছে না কেবল আকাশের পশ্চিম কোণে যে ক্ষুদ্র

বৌপ্যময় শিশুটি খিল খিল করে হাঁসচে। তার হাঁসির কারণ বুঝি বাহাদুরির। সকলেই, ভয়ে হোক, দুঃখে হোক, ছুটে পালাচ্চে। কেবল সেই-ই, বালক হয়েও আকাশের কোণে নির্ভীক হৃষ্ট মুখে বসে আছে। এতে কি তার কম বাহাদুরি?

অমিতা দুনিয়ার খেলা দেখছিল বৈচিত্রের রঙ্গমঞ্চে।

মাঝে, একবার তার খোকা জেগে উঠে তার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করে দিল। অমিতা উঠে, তাকে কোলে নিয়ে, দুধ খাইয়ে আবার শুইয়ে দিল। আকাশের চাঁদ-থানার মত খোকা অনেক হাঁসি হেঁসে বাহাদুরি দেখালো। আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

গাড়ি কিন্তু ঠিক চলেছে। তখনও থামবার তার নাম নেই।

আবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে অমিতা প্রকৃতির খেলা দেখতে লাগলো। চক্ষে ঘুম নাই। জাগরিত চিত্ত এখন তার সখী।

* * *

রাত তখন অনেক। গাড়ি কি একটা বড় ষ্টেসনে এসে শেষে দাঁড়াল।

অমিতা গাড়িতে বসেই ছিল, ঘুম মোটে তার চোখে লাগে নি।

হঠাৎ দেখলে, গাড়ি থামতেই ঐ তরুণীটি যুবকটির সঙ্গে প্লাটফর্মে নেমে গেল। বৃদ্ধটি একা রইলেন।

একটু পরে অমিতা জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখে, ঐ যুবক আর তরুণীটি হাত ধরাধরি করে প্লাটফর্মে বেড়াচ্চে। কৌতূহল-পরবশ হয়ে সে দেখতে লাগলো। হঠাৎ তার চোখে পড়লো যুবকটি যে সিগারেটটি ধরিয়ে মুখে টানছিল তার অর্দ্ধদগ্ধ অংশ ঐ তরুণীকে দিল, এবং তরুণীটি অবাধে তার সুমুখেই সিগারেট টানতে আরম্ভ করে দিলে।

অমিতা বিস্মিত হলো, ভদ্রলোকের-ঘরের মেয়েছেলে সিগারেট খায় ? কে জানে ?

অমিতা মুখ ফিরিয়ে নিলে। কামরার মধ্যে আর কেউ জেগে ছিল না। কিন্তু তাহলেও অমিতা শুনতে পেলো, কে অতি করুণ স্বরে বলচে 'মণি, মণি, একটু জল দাও। 'বড় জল তেষ্টা !

অমিতা দেখলে তার স্বামী ত অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তখন সে বুঝতে পারলে, ঐ রুগ্ন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধটি তৃষ্ণায় জল চাইচেন। অথচ তাঁর স্ত্রী, বাহিরে ভগ্নিপতির সঙ্গে—

অমিতার মন করুণায় সিক্ত হয়ে উঠলো। সে উঠে, তাদেরই কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে বৃদ্ধের কাছে গেল এবং বললে, জল খান। বৃদ্ধ হাঁ করলেন, অমিতা গ্লাস থেকে অল্পে অল্পে জল ঢেলে দিল।

বৃদ্ধ স্বস্তিতে বললেন : আঃ ! কে ? মণি ?

অমিতা বললে : আমি মণি নই ; আমি একজন যাত্রী।

বৃদ্ধ বললেন : তুমি মণি নও ? তবে মণি কোথায় গেল ? হরিশবাবু কোথায় গেল ?

অমিতা বললে : তা জানি নে।

বৃদ্ধ শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ; কিন্তু আর কোনও কথা কইলেন না।

অমিতা ফিরে এসে তার জায়গায় বসলো। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার একবার কৌতূহল হ'ল। দেখলে, মণি আর তার 'বড় ভালো' ভগ্নিপতিটি দুজনে একটা চায়ের দোকানে বসে খান পাঁচ সাত চপ কাটলেট নিয়ে বসেছেন এবং সেগুলো উদর নামক নিশ্চিন্তিপুরে পাঠাচ্ছেন। খানিক পরে দেখলে, তাদের খাওয়া শেষ হলো ; এবং প্রত্যেকে একটি ক'রে সিগারেট বার ক'রে খেতে লাগলো।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো। মণি ও ভগ্নীপতি হাঁসতে হাঁসতে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠলো। হরিশবাবু মণির কোমর ধরে গাড়ির ওপরে তুলে নিলেন।

তাদের দেখে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় গিছলে তোমরা?

মণি বললে: তোমায় নিয়েই পড়ে থাকমু? আমরা খাবো দাবো না?

বৃদ্ধ বললেন: গাড়িতে বসে খেলেই হতো।

মণি বললে: ফেরিওয়ালার কাছে কি ভাল খাবার পাওয়া যায়? তোমার যতো সব অনাছিষ্টি কথা!

বৃদ্ধ বললেন: আমার জন্যে না হয় একটু কষ্ট করলে! আমি যে মরি।

তরুণী বললে: তুমি মরো ত মুই কি করমু? মরবার সময় হ'লে কি কেউ ঠেকায়ে রাখতে পারে?

ব'লে তরুণী যুবক হরিশের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ ক'রে কি ইসারা করলো। তার চক্ষে হাঁসি গড়িয়ে পড়ছিলো। হরিশবাবুরও চক্ষু হ'তে আত্মপ্রসাদের বাষ্প ছুটকে বেরুতে লাগলো।

অমিতার মন এই সব দেখে ঘৃণায় ভরে উঠলো। সে আর ওদিকে মোটেই চাইলে না। চোখ বুজিয়ে বসে কতো কি ভাবতে লাগলো।

* * *

ভোর বেলায় গাড়ী এসে সিমুলতলায় লাগলো। ঈশানবাবু ও তাঁর ভাই বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। সেই তরুণীটি যুবকের কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। ঘুম ছিল না কেবল অমিতার চোখে।

অমিতা প্রথমে জানতে পারেনি যে সিমুলতলা ষ্টেশন এসে গেছে : সে দুশ্চিন্তায় এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

ঐ তরুণীটির ইতিহাস আরও তাকে বিকল করে তুলেছিল।

হঠাৎ একটা কুলি যাই 'সিমুলতলা' বলে চিৎকার ক'রে উঠেছে, অমনি অমিতা চমকে উঠলো। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে তার স্বামীকে ও দেবরকে ডেকে তুললো। তাঁরা তখন তাড়াতাড়ি উঠে, মুটে ডেকে, মাল নামিয়ে, তবে রেহাই পান।

* * *

সিমুলতলায় এসে অমিতার বিমর্ষভাব অনেকটা কেটে গেল। কি উন্মুক্ত উদার প্রান্তর! কি স্নিগ্ধ অপরিসীম হাওয়া! কলকাতার কলরবপূর্ণ আবর্জ্জনাময় বাসাবাড়ী থেকে এখানে এসে তার মনে হতে লাগলো, সে যেন নরককুণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে নন্দনকাননে এসেছে।

ঈশানবাবুরও মনে হ'ল, তিনি এইবার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। অমিতাকে ডেকে বললেন : অমিতা, এইবার আমি ভাল হয়ে যাব।

অমিতা বললে : কেন হবে না? এইবার হবে। আমি ভগবানকে এত করে ডাকচি, তার কি কোনও প্রত্যুত্তর হবে না?

ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : অমিতা, তুমি কাল সমস্ত রাত ঘুমোও নি?

অমিতা বললে : ঘুমুবো কি? একটা মেয়ে গাড়ির মধ্যে কি কাণ্ড করছিল, দেখতে পেলে না?

কই, আমি অতো নজর করি নি।

ভালই করেছো। সেটা নজর করবার জিনিষ নয়।

কি কাণ্ড করছিলো?

নাঃ। সে তোমার শুনে কাজ নেই। আচ্ছা আর একদিন বলবো।

অমিতা গৃহস্থালী গুছোতে লেগে গেল।

(১১)

এত বড়ো বাগান এবং একসঙ্গে এতগুলো ফুলগাছ, অমিতা এর আগে যে-সব জায়গায় দেখেছে, সেগুলোর কোনটাই তার নিজের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাই সে যখন সিমুলতলার বাসাবাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ এবং সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান দেখতে পেলো, তখন মনের সব অন্ধকার কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল, সে তা নিজেই বুঝতে পারলে না।

ওরা এখানে এসেছে শুক্রবার, আর আজ শুক্রবার,—তাহ'লে মাত্র এক সপ্তাহ কেটেছে,—এমন সময় একদিন ভোর বেলায় অমিতা বিছানা থেকে উঠে আবিষ্কার করলো, গেটের বাহিরে বসবার যায়গাটিতে কে একজন ভদ্রলোক একটি 'সুটকেস্' ও একটি 'হোল্ড্-অল' নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছেন! গেট্ থেকে বারাণ্ডাটা একটু দূরে ছিল; সুতরাং লোকটিকে দেখবার পক্ষে অমিতার একটু অসুবিধা ঘটছিল। মালী এখনও তার কুড়ে ঘরটি ছেড়ে বার হ'নি; কিন্তু অমিতা আগত ভদ্রলোকটির পরিচয় সঠিক নির্দ্ধারণ না ক'রে আর থাকতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল, যিনি সকলের চেয়ে অপ্রত্যাশিত,—এবং যিনি

সকলের চেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত' ঠিক তিনিই বুঝি শয়তানের রূপ ধরে, হঠাৎ হাওয়ার উপর ভর ক'রে, তাঁদের বাড়ীতে সমাগত !

তাড়াতাড়ি বারাণ্ডা ছেড়ে গেটের কাছে এসে, অমিতা একেবারে স্তম্ভিত। একটা গোখ্‌রো সাপ সম্মুখে দেখলেও অমিতা অতো চমকে উঠতো না ... ঠিক তাই, ধীরেন বাবু !

দূর থেকে অমিতাকে আসতে দেখে ধীরেনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললে : তোমাদের টেলিগ্রাম পেয়েই রওনা হয়ে এলুম, অমিতা !·· ঈশানবাবু,—অ্যাঁ, হাঁ,—ভালো আছেন তো ?

'কেন, তাঁর কি হয়েছে ?' অমিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"তবে টেলিগ্রাম করেছো, যত শীঘ্র পারি আসতে ?'

"টেলিগ্রাম করেছি ?" অমিতা আকাশ থেকে পড়ে।

"এই দেখো !" পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম্ বার করে ধীরেনবাবু দেখালো।

অমিতা এক পা এক পা ক'রে গেটের কাছে এসে গেটের চাবি-কুলুপ খুলে ফেললো। আসবার সময়ে সে চাবিটা সঙ্গে করেই এসেছিল। সে বিস্মিত হবার সময়েও প্রয়োজন ভোলে না।

টেলিগ্রামের ফর্ম্টা হাতে নিয়ে সে বললে : না, কখনই না ! আমরা টেলিগ্রাম করিনি। এটা কোথা থেকে পেলে তুমি; আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

"বিপদের মুহূর্ত্তে হয়তো তাড়াতাড়িতে ক'রে ফেলেছিলে, এখন তা আর মনে নেই ! মানুষের এমন অনেক সময় হয় !···যাক্ ! কোনও বিপদ ঘটেনি তো ? তা'হলেই হলো ! কে টেলিগ্রাম করেছিল, সে নিয়ে আর এখন মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই।"...

"আবার কিন্তু? তোমার মালী কি চাকর কেউ নেই? আমার মোট-ঘাটগুলো ভেতরে নিয়ে যেতো!" ধীরেনবাবু অমিতার মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

"চলো,—আমিই নিয়ে যাচ্ছি!" ব'লে অমিতা স্যুটকেসটা হাতে ক'রে তুলে নিলো।

"তুমি কেন? তুমি কেন? তুমি রোগা মানুষ,—তুমি পারবে কেন? আচ্ছা, আমিই ওগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছি! ছাড়ো,—ছাড়ো!" ধীরেনবাবু অমিতার হাত থেকে স্যুটকেস্‌টা ছিনিয়ে নিলো।

অমিতারা একজন চাকর রেখেছিল; সে এতক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। সে এসে ধীরেনবাবুর হাত থেকে মোটটি নিয়ে ঝগড়ার মীমাংসা সাধন করে দিল।

ধীরেনবাবু বারাণ্ডায় এসে বললে: কই, ঈশানবাবু কোথায়?

পাশের ঘর থেকে, একটি পরিচিত কণ্ঠ, কাশী ও আনন্দের তরঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে উত্তর দিল: ধীরেনবাবু এসেছেন? আসুন, —খক্ খক্—আসুন! আজ আমাদের,—হাঁ, খক্ খক্—কি আন—ন্দ— খক্ খক্ খক্,—আঃ! এই কাশীটা,—হাঁ (বলতে বলতে এতো কাশতে লাগলেন, যে বাকিটুকু আর তাঁর বলা হলো না!)

"—কই, আপনার কাশী তো কিছুমাত্র কমেনি দেখচি! সিমুলতলার হাওয়া এখনও লাগেনি তা'হলে?" ধীরেন অভিমত প্রকাশ করলো।

ঈশানবাবু কাপড়খানা ভাল ক'রে পরতে পরতে, একেবারে বারাণ্ডায় এসে হাজির। অমিতা 'হাঁ, হাঁ' ক'রে উঠলো। "কচ্ছ কি? কচ্ছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে যে? এই দেখো, খালি গায়ে কখনো ঘরের বাইরে আসতে আছে?"

"আছে, আছে! ধীরেনবাবু এলে আছে! উনি আমাদের যে উপকার

করেছেন,—তা'তে ওঁকে আসবার সাথে সাথে অভ্যর্থনা না করলে আমার, আমার কাশীটাও বন্দ হবে না !"

"জানিনে বাপু !" ব'লে অমিতা তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে একটা কোট ও গায়ের কাপড় এনে, নিজেই সেগুলো ঈশানবাবুর গায়ে পরিয়ে দিল।

তারপর, এতো ধন্যবাদ ও প্রশংসা, প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও উত্তর আরম্ভ করে দিলেন ধীরেন বাবুর সঙ্গে যে, অমিতা বারণ ক'রেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারলো না।

"অমিতা ? অমিতা ? এক কাপ্ ভাল দেখে চা তৈরি ক'রে আমার অযাচিত-হিতকারীকে খাইয়ে দাও দেখি ? আর দোকান থেকে কিছু মিষ্টান্ন—না হয়, আমিই এনে দিচ্ছি ! আমাকে দুটো টাকা দাও দেখি !"

"প্রয়োজন হবে না ঈশান বাবু, আমি সঙ্গে করে এনেছি বর্দ্ধমান থেকে কিছু সীতেভোগ !...এই চাবিটা নাও, আমার স্যুটকেশটা খোলো তো !" ব'লে একগোছা চাবি পকেট থেকে বার ক'রে ধীরেন বাবু ফেলে দিল অমিতার সম্মুখে !

অমিতা আপত্তি তুলে বললে : তা'হলেও আমাদের তো একটা কর্ত্তব্য আছে অতিথি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি !

চাবি তুলে না নিয়েই সে চলে গেল ঘরের মধ্যে টাকা আনতে।

(১২)

সে দিনটা এক-রকম কাটলো। রাত পোহাতেই ঈশানবাবু বেরিয়ে পড়লেন একটু মাংস যোগাড় ক'রে আনতে। এটা কৃতজ্ঞতা দেখাবার আগ্রহাতিশয্য।

তাঁর বিশ্বাস, শিমুল তলায় যে পাঁঠার মাংস পাওয়া যায়, সেগুলি খুব কোমল ও সুস্বাদু। এই এক সপ্তাহেই তাঁর সে বিশ্বাস দৃঢ়-মূল হয়েছে। তিনি এর কারণ ঠিক ক'রে নিয়েছেন এই যে, এখানকার পাঁটা এবং মুরগী টাট্‌কা ঘাস তৃণ ভক্ষণ করে উন্মুক্ত প্রান্তরে—আর কলকাতায় যে সব উক্ত জানোয়ার খাদ্য-রূপে মানুষের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে, তারা পায় ও খায় শুধু শুষ্ক নীরস ঘাস; কাজেই কলকাতার বাজারের মাংস হয় লৌহ বা কাঠের মত শক্ত ও একান্তই স্বাদ-হীন—এবং শিমুলতলার মাংস হয় অতি সুকুমার, সহজ পাচ্য ও সুস্বাদু। কাজেই এমন জিনিষটা তাঁর মহৎ-উপকারী, সৌভাগ্য-আনীত অতিথিকে আজ খাওয়াবেন বৈ কি।

ঈশানবাবু বাহির হয়ে গেলে অমিতা গিয়ে ঢুকলো রসুই-ঘরে। ধীরেনবাবু বারান্দায় বসে রইলেন প্রায় একা, কেননা অমিতার দেবর ও খোকাটি সেখানে থাকলেও ধীরেনবাবু তাদের সঙ্গ তেমন পছন্দ করছিল না। ওটা যেন জল ও তেলের মিশ্রণ, যতো মিশানো যায়, ওত যেন আবার আলাদা হয়ে যায়।

কি একটা জিনিষ রন্ধন করতে করতে হঠাৎ অমিতা চমকে উঠে দেখে, সম্মুখে ধীরেন বাবু!

"না, না. তুমি এঘরে কেন ধীরেন বাবু? এতো ধোঁয়া আর গরমের মধ্যে তুমি বাবুলোক, দাঁড়াতে পার্ব্বে কেন?·· চলো, চলো, বারাণ্ডায় চলো, আমি যাচ্চি।"

"আমি একটা কথা তোমায় নিভৃতে বলতে চাইছিলুম!"

"নিভৃতে?" অমিতা একটু দমে গেল।

"হাঁ, নিভৃতে! যাতে তোমার দেওর বা ঈশান বাবু না শুনতে পায়!"

অমিতা আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ ঢাকা দিয়ে বললো: কি বলো!

—"বলছিলাম কি! তোমার এখানে আসবার আগে, আমি তোমাদের

বাড়ীর ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে ছিলুম। ডাক্তার বাবু আমায় যা বলে দিলেন, সেই কথাগুলো বলতে চাইচি।... তিনি বলেন কি, জান? তিনি বললেন, ঈশান বাবুকে যে-ব্যায়রাম ধরেছে, তাতে ক'রে কারুর উচিত নয়, তাঁর সঙ্গে একঘরে বা একবিছানায় শয়ন করা।...কাল এসে আমি যা দেখলুম, তাতে এ নিষেধটা তোমার ওপরেই বেশী প্রয়োজন হয়।... অবশ্য আমি জোর করতে পারিনে: কিন্তু,—তুমি এটা বুঝে দেখো!"

"ডাক্তার বাবু আর কি কথা আমাদের বিষয়ে বললেন?" অমিতা প্রশ্ন করলো।

"আর যা বললেন, তা তোমার না শোনাই ভাল। অর্থাৎ তোমার মনটাকে খুব দৃঢ় করতে হবে!... তোমাদের, বিশেষ তোমার একটা খুব বড়ো বিপদ শীঘ্রই আসতে পারে! বুঝলে অমিতা... আর আমি খুলে কি বলবো? তুমিত বুঝতেই পাচ্ছ!"

অমিতা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অনেক অতীত, অনেক বর্ত্তমান, অনেক ভবিষ্যৎ দৃশ্য ছায়া-চিত্রের দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল ছবির মত তার মনের মধ্য দিয়ে খেলে যেতে লাগলো। অনেকটা সময় চুপ ক'রে থেকে সে শেষে বললে:

"ধীরেনবাবু? এই সব কথা বলবার জন্যেই বুঝি তুমি শিমূলতলায় নিজ হ'তে এসেছো?"

"কেন, কথাগুলো কি অপ্রয়োজনীয়? কথাগুলো তোমার জীবন-মরণ সমস্যা, তা জানো? তুমি যদি আর এক দিনের জন্যও ঈশান বাবুর সঙ্গে এক ঘরে বা এক বিছানায় শয়ন করো,—তাহ'লে তোমাকেও যক্ষ্মা রোগে ধরবে, তা জানো?

"তাতে তোমার কি ধীরেন বাবু?"

"আমার কি? তুমি এতবড়ো কথাটা আমায় বললে? তুমি কি জানো না, যে তোমায় আমি কতো—। এখনও! এখনও আমি তোমাকে দেবতার মত পূজা করি। তোমাকে কি রোগ ধরে না ধরে, তুমি কিসে সুস্থ থাকো না থাকো,—এইটাইতো এখন আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিষয়!··· তুমি এখনও আমার ধ্রুব-তারা, এ কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

"ভুলে যাচ্ছি কেন? কারণ, নিয়তি আমাকে ভুলে যেতে আদেশ করেছে। কারণ, বিয়ের মন্ত্র তোমাকে আর অধিকার দেয় না, আমাকে ধ্রুব-তারার মত ভাবতে! আমাকে ভুলে যাও, ধীরেন বাবু! তোমাকে হাত-যোড় ক'রে অনুরোধ কচ্ছি, আমাকে ভুলে যাও। নইলে,—নইলে—" বলতে বলতে অমিতা কেঁদে ফেললো।

"ওকি? কাঁদচো কেন? আমি এমন কি কথা বলেছি?" ব'লে ধীরেনবাবু অমিতার চক্ষু মুছিয়ে দিতে এগিয়ে গেল।

"সরে যাও, সরে যাও! আমাকে ছুঁয়ো না। আমাকে যদি ছোঁও, তাহ'লে আমি তোমাকে খুন করবো! খুন করবো ধীরেন বাবু!"

ধীরেন ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে গেল তখনই।

(১৩)

সন্ধ্যার সময়ে অমিতা প্রত্যহ বাটী-সংলগ্ন গোলাপগাছের বাগানটিতে ঘুরে বেড়ায়। ঈশানবাবুর শরীর যেদিন ভাল থাকে, সেদিন তিনিও অমিতার সঙ্গে বেড়ান। আজ ধীরেনবাবু তাঁকে আক্রমণ করে রেখেছে, কাজেই আজ আর ঈশানবাবু সঙ্গে নাই; অমিতা একাই বেড়াচ্ছিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। অমিতা একটি উদ্যানস্থিত মহুয়াগাছের তলায় বসে নেশাখোরের মত স্বপ্ন দেখছিল। মনটা আজ মোটেই ভাল নয়; কলকাতার ডাক্তারবাবু ধীরেনবাবুর মুখ দিয়ে যা ব'লে পাঠিয়েছেন, সেই কথাগুলোই তাকে গোখরো সাপের বিষের মত জর্জ্জরিত ক'রে রেখেছে। তার ওপর মহুয়া ফুলের গন্ধ! আফিংয়ের নেশার মত দুই নেশায় অমিতা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলো।

হঠাৎ কি একটা চাপে তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখে, সর্ব্বনাশ! ধীরেনবাবু পাশে বসে তার গালের ওপর মুখখানা এনেছে! আর কোথায় আছে অমিতা! বাঘিনীর মত তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে ধীরেন বাবুকে বললেঃ দূর্ হও এখান থেকে! আমাকে অন্ধকা[illegible] এক্লা দেখতে পেয়ে শেষে নিজের মনুষ্যত্ব ভুলে গেছো? এখন য[illegible] নইলে, আমার দেওরকে ডেকে দুজনে মিলে তোমাকে খুন করবো!

ধীরেনবাবু আর কথাটি না ক'য়ে দ্রুতপদবিক্ষেপে সেখান থেকে সরে গেল। অমিতা কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে!

সন্ধ্যার পর যখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এলো, তখন ঈশান বাবু বারাণ্ডায় ব'সে ধীরেন বাবুর খোজ নিলেন। তিনি অমিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ধীরেন বাবু যে 'একটু বেড়িয়ে আসি' ব'লে হঠাৎ কথা কইতে কইতে বেরিয়ে গেলেন, এখনও ফিরলেন না কেন?"

অমিতা কোনও উত্তর দিল না।

"তোমায় কিছু ব'লে গেছেন তিনি অমিতা?"

অমিতা যেন কথাটা শুনতে পেল না। সে অন্য ঘরে চলে গেল।

কিন্তু ঈশান বাবু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি তাঁর ভাইকে ও চাকরকে

ডেকে পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করলেন, । একটু দমে গেল; কিন্তু তবু তাঁকে তখন তিনি চাকরকে বললেন, "হ্যাঁ। সিমুলতলায় শরীর সারতে এসে ওদিকের রাস্তায় খোঁজ করে আয়। হয়তো; মন খারাপ কোরো না। তা হারিয়ে ফেলেছেন।" ভাবনার কারণও ঘুচবে

"পথ হার'বার লোক তিনি ন'ন। সোজা পথেই গেছেন" অমিতা ঘরে ঢুকে এসে বললো।

"তার মানে?"

"জানি না।" ব'লে ফস্‌কে অমিতা আবার অন্য ঘরে চলে গেল।

আদেশমত চাকর হ্যারিকেন আলো নিয়ে অনেকদূর খুঁজে এলো,—এমনকি ষ্টেশন পর্য্যন্ত। এসে বললে: নতুন বাবুকে দেখলুম, কলকাতার গাড়ি চড়ে চলে যেতে। বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'আপনি না ব'লে কয়ে চলে যাচ্চেন কেন?' বাবু কোনও কথা কইলো না।

"অ্যাঁ? সে কি কথা?" ঈশান বাবুতো একেবারে অবাক্!

"আমরা কি অপরাধ করলুম যে, তিনি রাগ ক'রে চলে গেলেন? কি ভয়ানক কথা! অমিতা বুঝি কোনও অযত্ন করেছো?...ভাল করোনি অমিতা ভাল করোনি! অতিথি মানুষের দেবতা।...বিশেষ, তিনি আমাদের কতো উপকার করেছেন!"

অমিতা শুধু গুম্ হয়ে বসে রইলো।

ঈশান বাবু সেইদিনই ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ধীরেন বাবুকে চিঠি লিখলেন। ধীরেন বাবুও চিঠির উত্তর দিলেন:—

"ঈশান বাবু ও অমিতার কোন অপরাধ নেই!—সহসা একটা জরুরি কাজে কলকাতা থেকে তার পেয়ে, তিনি ষ্টেশন থেকেই রওনা হয়েছেন। কাহাকেও কিছু বলে আসবার সময় পান নি। এজন্য তিনি বড়ই দুঃখিত। অপরাধ যেন ক্ষমা করেন ঈশান বাবু ও অমিতা!" ইত্যাদি।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। তশিয়াছেন, সেটা ঈশান বাবুর কাছে তলায় বসে নেশাখোরের মত স্বপ্ন দেঅমিতা বুঝলো তার নিগূঢ় তত্ত্ব।
কলকাতার ডাক্তারবাবু ধীরেনব
কথাগুলোই তাকে গোথকে
তার ওপর সদ্য

(১২)

তারপরেও অমিতারা মাস দুয়েক রইলো শিমুলতলায়। ধীরেন বাবু মাঝে মাঝে চিঠি দেয় অমিতাকে। অমিতা না পড়েই সেগুলো পুড়িয়ে ফেলে আগুনে। ঈশান বাবু জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দেয় না।

একদিন অপরাহ্নে, অমিতা বাগান থেকে কতকগুলো গোলাপ ফুল তুলে, সেগুলিতে একটা তোড়া রচনা করে আনন্দে নাচতে নাচতে ঈশানবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল। ঈশানবাবু দেখে বললেন: তার চেয়ে একটা মালা তৈরী করে নিয়ে এলে না কেন?

মালা? কার গলায় পরাতুম?

কেন, আমার গলায়?

তোমার? বড় ভয় করে। তোমার আজ কাল যে মনের অবস্থা, আর কথায় কথায় আমার সঙ্গে যে ঝগড়া কচ্ছ, মালা দেখলে হয়তো আরও রেগে উঠতে।

ঈশানবাবু আত্মদোষ স্বীকার করে বললেন: সত্যি অমিতা, আমি আজকাল বড়ো ঝগড়াটে হয়েছি, না? হবো না? একদিকে নিজের শরীরের ভেতর যেখানে যতো অনু পরমাণু আছে, সবাই মিলে ঘরোয়া বিবাদ আরম্ভ করে দিয়েছে—তার উপর জীবনধারণ করতে গেলে, যেটা বহির্জগতে সকলের চেয়ে বেশী দরকার, সেই পয়সার জন্যেও কতোটা হীনতা না সে দিন স্বীকার কর্ত্তে হোলো! মানুষ সবদিক থেকে তাড়া খেলে একটু ক্ষেপে উঠতে পারে বৈ কি!

ঈশানবাবুর কথায় অমিতাও একটু দমে গেল; কিন্তু তবু তাঁকে চাঙ্গা রাখবার জন্যে সে বললে: সিমুলতলায় শরীর সারতে এসে তুমি আর ওসব কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না। তা হ'লে দুদিকই যাবে, শরীরও ভাল হবে না, ভাবনার কারণও ঘুচবে না। যাও না, এই তো রোদ পড়েছে, একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো না?

ঈশানবাবু বললেন: তাই যাই। তবে একা যেতে সাহস হচ্ছে না। তুমি যদি সঙ্গে যাও—

অমিতা প্রস্তাব শুনে সন্তুষ্টই হোল। সে গৃহস্থালীর সামান্য এদিক্ ওদিক কিছু সেরে নিয়ে ঈশানবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

সটান দক্ষিণদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তারা একেবারে মাঠের উপর এসে পড়লো। সে সময় মাঘ মাস। মাঠে ধানকাটা সব হয়ে গিয়েছে, ধানও কৃষকদের খামারে জমা পড়ে গেছে। মাঠ হ'য়ে আছে একেবারে অনাবৃত, অনাদৃত ও অনন্ত-বিস্তার। তার সীমানা যেখানে গিয়ে আকাশের সঙ্গে ঠেকেছে, সেখানে শুধু একটা ছায়া-রেখা দেবতাদের স্বপ্নের মত জড়িয়ে আছে। পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে সূর্য্যদেব বসে বসে তরুশীর্ষের উপর অভিমান ফলাচ্ছেন; কিন্তু তাঁর শেষ বিদায়ের আর দেরি নাই; পক্ষীরা তাঁর শেষ জয়ন্তী গেয়ে গেয়ে জগৎকে জানিয়ে দিচ্ছে।

এতো প্রশস্ত মাঠের ওপর এসে অমিতা যেন নিজেকে একেবারেই মুক্ত বলে বিবেচনা করতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো, সে যেন আজ সত্য-জীবনের আস্বাদ পেলে! কলকাতায় যেন সে মৃত্যুর ঘরে জীবনের বন্ধন নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ধীরেনের কথা মাঝে মাঝে ঠেলে ওঠে মনে,—কিন্তু ঘৃণায় সে সেগুলো চাপা দেয়!

ঈশান বাবু অনেক কথাই বকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে সব কথায় ততো কাণ না দিয়ে অমিতা এই মুক্তির উৎসবকেই মনে মনে উপভোগ করতে লাগলো। সাধ যেন তার কিছুতেই মিটছিলো না; মুক্তির অবাধ জ্যোৎস্না যেন তার মনে পূর্ণিমার ঢেউ তুলে দিয়েছিল।

একটা শাল গাছের তলায় তারা দুজনে বসে, নানা কথায়-বার্ত্তায় ফেরবার কথা একেবারেই ভুলে গেল। এর মধ্যে কখন যে একখণ্ড মেঘ এসে আকাশের ওপর ধোঁয়ার আস্তরণ পেতে দিয়েছিল, তা তারা কেউ টের পায় নি। যখন হঠাৎ একটা ঝড় উঠে গাছ এবং মাঠকে বেশ নাড়া দিতে আরম্ভ করে দিল, তখন তাদের সাড় এলো। কিন্তু খবর পেতে না পেতেই টুপ্ টুপ্ ক'রে এমন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল, যে, অমিতা ঈশানবাবুর ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু উপায় কি? মেঘ কি বৃষ্টি তো কারুর কথা শুনে না! তারা হোলো মানুষের শক্তির বাহিরে! কাজেই অমিতা আঁচলটা খুলে ঈশানবাবুর মাথায় চাপিয়ে, গাছতলায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেবীর নিষ্ঠুর আব্দার সহ্য করতে লাগলো।

ঈশানবাবু বললেন: সবই হোলো অমিতা, কেবল আসবার সময় ছাতিটা আনতে ভুলে গেলুম।

অমিতা বললে: এমন সময় যে বৃষ্টি নামবে, তা কেমন ক'রে জানবো বলো! যখন বেরুলুম, তখন তো আকাশ চারিদিকে পরিষ্কার! এর ভেতরে কথা কইতে কইতে যে বৃষ্টি আসবে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর।

ঈশানবাবু দার্শনিকের মতো বললেন: কিন্তু স্বপ্নের অগোচর জিনিষগুলিই মানুষের গোচরে বেশী আসে অমিতা! যেটা ভাবনার

মধ্যে আসেনি সেইটার আসাটাও আবার বেশী নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুর-গুলোকে নিয়েই সংসারের যতো দুঃখ, যতো অশান্তি!

কথাটা শুনে অমিতা হঠাৎ চুপ করলে। কিন্তু তার একটু পরেই বলে বসলো: এই রকম একটা অশান্তি আমাদের জীবনেও শীঘ্র আসবে এই টাকা ধার করাটা নিয়ে, তা আমি বলে রাখলুম।

ঈশানবাবু বললেন: তোমায় কিছু বলতে হবে না, অমিতা, আমি সেটা খুবই ভয় পাচ্ছি। আমার বাবা টাকা ধার করাকে বাঘের মত ভয় করতেন। দোকানে এক পয়সা দেনা থাকলে, তিনি আগে সেটা চুকিয়ে দিয়ে তবে নিশ্বাস ফেলতেন।...কোনো বন্ধুর কিছু টাকা পাওনা থাকলে, সেটা না দিয়ে, রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না। আমি তাঁরই ছেলে অমিতা। আমাকে ঋণের বিভীষিকা আর নতুন করে দেখিও না।

বৃষ্টি অনেকটা থেমে এলো। আকাশে মেঘ উঠেছিল খুবই আকস্মিক, এবং খুবই ছোট। মাঘের শেষে অপরাহ্ণের দিকে এ রকম মেঘ-সঞ্চয় মাঝে মাঝে হয়ে থাকে আকাশে। তার আবির্ভাবও যতো অপ্রত্যাশিত, বর্ষণও ঠিক সেই পরিমাণে অপ্রচুর।

বৃষ্টি থামতে অমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ঈশানবাবুকে বললে: চলো এই বেলা বাসায় যাই! তোমার এই শরীরের ওপর ঠাণ্ডাটা লাগলো, কাজটা বড়ো ভাল হোলো না!

ঈশানবাবু উত্তরে বললেন: ঠাণ্ডা যদি এত অল্পে লাগে, তাহ'লে বুঝতে হবে আমার বুকটা ঠাণ্ডার ঘর বাড়ী হয়ে গেছে।'

ঈশানবাবু চলতে আরম্ভ করে দিলেন। আকস্মিক বৃষ্টিতে অমিতা যতো ভয় পেয়েছিলো, ঈশানবাবু ততো পাননি

কাপড়ের আঁচলটা ঈশানবাবুর মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে অমিতা

বেশ ক'রে নিংড়ে নিলে, তার পরে সেটা বামহাতে ধরে চলতে আরম্ভ করলো।

একেই শীত এখনও প্রভুত্ব-লুব্ধ জমিদারের মতো জেঁকে বসে প্রজাশাসন চালাচ্ছিল, তার উপরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে, শীত হয়ে দাঁড়ালো একেবারে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নাদির শার মতো নরঘাতক! ঈশানবাবু ও অমিতা সেই শীতের মধ্যেই কাঁপতে কাঁপতে অতি কষ্টে বাসায় ফিরলেন। আরও কষ্টের কারণ হয়েছিল এই জন্যে যে দুজনেরই পরিধেয় বস্ত্র বৃষ্টির জলে একেবারেই সিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

(১৫)

বাসায় ফিরে এসেও অমিতা নিশ্চিন্ত হতে পারলো না; তার কেবলই ভয় হতে লাগলো ঈশানবাবুর জন্য। তারা এসেছে এখানে শরীর সারতে, কিন্তু দেশের গুণ কি প্রকৃতিকে অপমান করার পাপকে কি ক'রে চেপে রাখতে পার্বে, এই ভাবনাটাই কেবল ঘুরে ফিরে অমিতার মনে আসতে লাগলো। বৃষ্টিতে ভিজলে কি অযথা ঠাণ্ডা লাগালে, তার প্রতিক্রিয়াটা যে অবশ্যম্ভাবী, এর সত্যতা বারবারই তাকে পীড়ন করতে লাগলো।

সুটকেস্ থেকে অনেকগুলি শীত-বস্ত্র বার করে ঈশানবাবুকে সে বিপর্য্যস্ত করে তুললে, এবং দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে ঘরটাকে করে তুললো আণ্ডারের বাক্সের মত উষ্ণপ্রধান।

ঈশানবাবু একবার হেঁসে বললেন: অমিতা? ভগবান্ মানুষের বুকে ভয়-বৃত্তিটা বোধ হয় সৃষ্টি করেছিলেন, দুঃখের চেয়ে আগে। আবার ভয়ের আগে, বোধ হয় সৃষ্টি করেছিলেন মায়াকে!

অমিতা অচঞ্চলভাবেই উত্তর দিল: তা হবে! আমিতো অতো সৃষ্টি-তত্ত্ব জানিনে! তবে এটা জানি, যে রোগ-তত্ত্বের কাছে তোমার ও কোনো দার্শনিক মতই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

ঈশানবাবু আর কোন কথা কইলেন না; বুঝলেন এই নিতান্ত সরলা পতিপ্রাণা নারীটি তাঁর জন্যেই একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে; অতএব তাকে অধিক কথার চিমটি কাটা উচিত নয়!

সেদিন মধ্যাহ্ন যেতেই ঈশানবাবুর একটু জ্বর দেখা দিল। অমিতা তাপ-যন্ত্র দেখে বললে: এই দেখো! যা ভয় করেছি, তাই! কাল এই ঠাণ্ডাটা লেগে, আবার বুঝি এক কাণ্ড আরম্ভ হয়!

ঈশানবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: না অমিতা ভয় নেই! ও একটু জ্বর আজ বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে!

সেই আশাতেই অমিতা সেদিন সন্ধ্যাটা কাটালে; কিন্তু তার পর দিন যখন আবার জ্বর এলো, তখন তার মন একেবারে আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো!

জ্বর যে শুধু প্রত্যহ হ'তে লাগলো তা নয়, তার প্রকোপও খুব বেড়ে উঠলো। অমিতা তখন একজন ডাক্তার এনে দেখাবার প্রয়োজন অনুভব কর্লে।

ঈশানবাবুর এক দূরসম্পর্কের ভাই তাদের সঙ্গে এসেছিলো, দেখা শুনা করবার জন্য। তাকে ডেকে অমিতা বললে: ঠাকুরপো! একজন ডাক্তার না ডাকলে তো আর ফেলে রাখতে পারছি নে!

ঠাকুরপো সতীশ কথা শুনে যতোটা উদ্বিগ্ন হলো, তার চেয়ে বেশী

হ'ল বিস্মিত। সে হাঁ ক'রে অমিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: ডাক্তার আনতে হবে? কার জন্যে? আমার তো কোনো অসুখ করে নি!

তোমার করে নি, কিন্তু তোমার দাদার তো করেছে দেখতে পাচ্ছ!

দাদার অসুখ করেছে? কি অসুখ? জ্বর বুঝি? ও একটু শিউলি পাতা ছেঁচা খাওয়ালেই বোধ হয় সেরে যাবে! ওই সুমুখের মাঠে একটা শিউলি গাছ দেখে এসেছি, সেখান থেকে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে এনে দেবো?

অমিতা বিরক্ত হয়ে বললে: না, সে পরিশ্রম তোমায় করতে হবে না,—আর সে উপদেশও তোমায় দিতে হবে না। তা'র চেয়ে তুমি একজন ডাক্তারের খোঁজে বেরোও দেখি!

ডাক্তার আর দেখিও না বউদি, তার চেয়ে কবিরাজ দেখাও। আজকাল স্বদেশীর যুগে,—

তুমি কি এই সব তর্ক করতে এখেনে এসেছো ঠাকুরপো?

সতীশ অপ্রতিহত ভাবে বললে: সত্যি বউদি! মহাত্মাজী কি বলচেন, শুনেছো তো?

— মহাত্মাজী মাথায় থাকুন! তুমি তর্ক রেখে আমার কথাটা রাখবে কি না?

—আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু এবেলায় নয়, কাল সকালে যাবো! আজ আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে।

* * *

অমিতা দু'একদিনেই বুঝতে পারলে যে, যে-মানুষটিকে তারা এই বিদেশে সঙ্গে করে এনেছে তাদের দুর্দ্দিনে মাথায় ছাতা ধরবে বলে, সে আর যা কিছুই করুক, নির্ভরতার ধার একেবারেই ধারে না,

এটা নিশ্চয়। আলস্যের সঙ্গে তার যতো সম্বন্ধ, তার চেয়ে ঢের কম কর্ম্মতৎপরতার সঙ্গে।

এমন মানুষটিকে নিয়ে অমিতা যে কি ক'রে তার রুগ্ন স্বামীর স্বাস্থ্য রোগের কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবে, তা সে বুঝেই উঠতে পারলে না। মন তার বড়ই দমে পড়লো, এই অপ্রত্যাশিত স্বজন-আবিষ্কারে!

দু'দিন পরে একজন ডাক্তার এলেন বটে, কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতার ওপর অমিতারও যতো সন্দেহ হ'ল, তাঁর নিজেরও তার চেয়ে কিছু কম নয়। তিনি মেরুদণ্ডবিহীন দণ্ডধর; চিকিৎসক হয়ে রোগকে যতো দণ্ড দিতে জানতেন, তার চেয়ে বেশী দিতেন রোগীকে!

দু'এক দিনের ঔষধ-প্রয়োগেই সেটা প্রমাণ হয়ে গেল, বেচারী ঈশানবাবুর অর্দ্ধভগ্ন শরীরের ওপর দিয়ে! রোগ ত কিছু কমলোই না, বরং তার সঙ্গে তিনি এনে ফেললেন উদ্বিগ্নতা, নিরাশা ও সহায়হীনতা!

অমিতা প্রমাদ গুণলে! এই বিদেশে বিভূমে কি ক'রে যে এই বিপদসাগর থেকে উদ্ধার পাবে, তারই উপায় চিন্তা করতে লাগলো। ঈশানবাবু তাকে নতুন বুদ্ধি কিছুই দিতে পারলেন না, বরং যেটুকু দিলেন, সেটুকু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে আরও ভোঁতা করে তুললো।

তিনি বলেন: এ রোগের আর ওষুধ নেই। সুতরাং ভেবে আর কোনো লাভ নেই। এখন দেখছি, আমি নিজেই একটা রোগ। সেই জন্যে মনে হচ্ছে, আমি সরে গেলেই রোগ সেরে যাবে, তার আগে নয়!"

ঈশানবাবুর কথা শুনে অমিতা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে; কেননা সে স্বামীকে এত ভালবাসতো যে ভাব-প্রবণতা হয়ে পড়েছিল তার স্বাভাবিক।

তাছাড়া, এই ক'মাস রোগের সেবা ক'রে ক'রে স্বামীর ওপর এসে পড়েছিল ধাত্রীর অপরিমিত স্নেহ! মায়া-জগতে ধাত্রীস্নেহ ও মাতৃস্নেহে কোনও প্রভেদ থাকে না, কাজেই মা যেমন ক'রে পুত্রের সর্ব্বনাশের কথা জানতে পারলে বিকল হয়ে ওঠেন, অমিতাও ঠিক সেই রকম আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, ঐ ভগ্নস্বাস্থ্য অনন্যোপায় স্বামীর শরীরটিকে নিয়ে!

ভাল ডাক্তার দেখিয়ে একবার শেষ চেষ্টা কর্ব্বার জন্যে অমিতা স্থির করলো কলকাতায় তারা ফিরে আসবে। কিন্তু ঈশানবাবু তাতে আপত্তি তুললেন। বললেন: একহাজার টাকা ধার করলুম এক সদাশয় লোকের কাছে, শুধু বায়ু পরিবর্ত্তন করে রোগটা সারাবো বলে! কিন্তু যখন বায়ু-পরিবর্ত্তনই আমার রোগের রাস্তা প্রশস্ত করে দিলে, তখন আর কেন টাকা খরচ!…ধারের টাকাতো অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এসেছে, আর বাকিটা শেষ করো না। আমার রোগের চিকিৎসায় আর টাকা খরচ না ক'রে ঋণের চিকিৎসায় লাগিয়ে দাও।…চক্ষু যখন চিরদিনের মতো শীঘ্রই বুজুতে হবে, তখন আমার শেষ মূহূর্ত্তে এইটে জানতে দাও, যে, স্নেহের ঋণ-ছাড়া আর যে ঋণ আমি করে রেখেছি, সেটা অন্ততঃ খানিকটা শোধ করে এনেছি।"

অমিতা চক্ষু মুছতে মুছতে বললে: ঋণ অনেক মানুষকেই করতে হয়, আবার শোধ দেয়। সেজন্যে তুমি এতো অস্থির হচ্চ কেন?

ঈশানবাবু বাধা দিয়ে বললেন: না,না অমিতা! আমি শেষবারের মত স্থির হবার আগে, এই অস্থিরতাটাই আমাকে স্থির করতে দাও,—তাহ'লে, তা'হলে,—

বলতে বলতে ঈশানবাবুর হঠাৎ একটা দমকা কাশী এলো, এবং

সেই সঙ্গে ভলকে ভলকে রক্ত অবাধগতিতে বাহির হতে লাগলো। অমিতা দেখে শুনে ভয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল; তবু অনেক সাহস ক'রে সে দৌড়ে বাইরে গিয়ে ডাক্তার আনতে পাঠালো।

ঘরে ফিরে এসে দেখে, ঈশানবাবুর কাশী অনেকটা কম, কিন্তু রক্ত আগেকার মতই বের হচ্চে! কাশী কমবার পর, আর একটা উপসর্গ এসে জুটলো। অতিরিক্ত নিঃশ্বাসের কষ্টে ঈশানবাবু হাঁপাতে লাগলেন। অমিতা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বসে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, এবং তাতেই মনে হোল তাঁর কষ্টটা একটু যেন সাম্যভাব ধরলে।

কষ্টটা একটু কমলে, ঈশানবাবু আবার তাঁর মুখ খুললেন। বললেনঃ অমিতা? তোমার দুটি হাতে ধরি, যা ক'রে পারো, আমার ঋণটি পরিশোধ করে দিও; নইলে যে অজানা দেশে আমি যাচ্চি, সেখানে গিয়েও শান্তি আমি পাবো না। হয়তো কৈফিয়ৎ নেবার মতো কেউ সেখানে আছে; সে আমায় ছাড়বে না। পাই কড়া ক্রান্তি বুঝে নেবে। কিন্তু আমার তো বুঝিয়ে দেবার মতো কিছুই সেখানে থাকবে না। তাই তোমার ওপর ভার দিয়ে যাচ্চি; এখান থেকেই তার ব্যবস্থা কোরো।···আমার জীবনের আলো বোধ হয় শীঘ্রই নিভে যাবে; যে রকম গতিক দেখছি, তাতে আশার দিকের পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে আসচে।···আমি যেতে বসেছি, আমার জন্যে দুঃখ করো না; শুধু আমার অনুরোধটা রক্ষা করো।

এই নির্মম কথাগুলো বলতে ঈশানবাবুর কণ্ঠ একটুও কম্পিত হল না। নিরাশার শূন্য ঘরে সাহসের যে একটা অঙ্ক আপনা থেকে মাটি ফুঁড়ে ঠেলে উঠে, তারই জোরে তিনি তখন বলীয়ান। কাজেই,

অমিতার প্রত্যেক মর্ম্ম-তন্ত্রীতে ইস্পাতের আঘাত করতে করতে তিনি সমস্ত বিষয়টিই বেশ গুছিয়ে বলে গেলেন।

কিন্তু যাকে বললেন, সে যে কতো রক্ত ঢাললে তার মনের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা থেকে, তা তিনি জানতে পারলেন না। অনেক কষ্টে অমিতা আপনাকে দমন করলে, রক্তাক্ত মনের জমাট-বাঁধা ধৈর্য্য দিয়ে।

প্রত্যুত্তরে শুধু এই কথাটুকু বললে: তোমাকে যদি সত্যিই আমায় হারাতে হয়, তাহ'লে কি ভাবো, তোমার দিন-শেষের আজ্ঞা আমি একদিনও ভুলতে পার্ব্বো? ওগো, না গো না, আমি এত বড়ো মর্ম্মহীন নই যে তোমার কথা, তোমার স্মৃতি আমি একদিনও ভুলতে পার্ব্বো। তুমি আমার বাইরের চোখের সুমুখ থেকে সরে যাবে বটে, কিন্তু আমার মনের চোখ থেকে কে তোমাকে হটায়?

কথাটা শুনে ঈশানবাবুর চোখ বুজে এল, একটা অপূর্ব্ব তৃপ্তি তাঁর মুখের উপর আলো জ্বেলে দিল। মুখ দিয়ে যে অবিশ্রান্ত-ধারায় শোণিত-স্রোত বাহির হচ্ছিল, তার বেগও যেন খানিকটা কমে এল। অমিতা তাঁর বুকে হাত বুলুতে বুলুতে সেটা লক্ষ করলে। তারও প্রাণটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের হাওয়ায় শান্তি খুঁজে পেলে।

ঈশানবাবুর অনেক আপত্তি সত্ত্বেও অমিতা ঠিক করলে, সে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসবে; কেননা, তার বিশ্বাস, কলকাতায় এসে পড়তে পারলে, চিকিৎসাটা অনেকটা ভালো পথে চলতে পারবে।

রোগটা যে ভয়ানক, তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু আশা কে ছাড়ে? কলকাতার ডাক্তারদের মতেই বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সে স্বামীকে নিয়ে সিমুলতলায় এসেছিল, কিন্তু সেখানে যখন রোগের

কোনও উপকার হচ্ছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, তখন আর বিদেশে কামড়ে পড়ে থেকে লাভ কি?

এই রকম পাঁচরকম ভেবে, অমিতা আর সময় কাটালে না; দু-এক দিনের মধ্যেই বন্দোবস্ত করে কলকাতার গাড়িতে উঠলো।

(১৬)

যৌবনের প্রারম্ভে এক-একখানা মুখ এমন ক'রে এক-একটা মানুষকে তোলপাড় দিতে থাকে, যে, ঝড় থেমে গেলেও তার ঢেউ কিছুতেই থামতে চায় না।

সেই যে কবে অমিতার সাহচর্য্যে ধীরেনের মন বীচিবিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল,—যৌবনের চাঞ্চল্যে তার ইন্দ্রিয়গুলো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল,—এখনও এতদিন পরেও সে ঢেউ, সে শিহরণ সমতল হয়ে যায় নি। আকাঙ্ক্ষা দাঁড়িয়েছে লালসায়, লালসা বাধা পেয়ে পেয়ে বাঁধে-আটকানো জলরাশির মত, কেবল শক্তিতে বেড়ে উঠলো।

ধীরেনের পিতা মারা যেতে, ধীরেন তাঁর প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহ করলে সে খুব নিখুঁত-সুন্দরী কোনও তরুণীকে অনায়াসেই লাভ করতে পারতো, কিন্তু প্রাণ সেদিকে হয়ে উঠলো বিদ্রোহী।

যাকে চেয়ে সে পায়নি, ঠিক তারই জন্যে তার মন মরুভূমির তৃষা নিয়ে হয়ে উঠলো পিপাসিত।

সমাজের যে গণ্ডি, যে বাঁধন তাকে কিছুতেই দিতে পারে না তার ঈপ্সিত বস্তু,—সেই গণ্ডি, সেই বাধাগুলোকে সে কৌশলে

ভিড়োবার জন্যে অনেক সঙ্কল্প মাথায় আনতে লাগলো। তার বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শও অনেক নিতে লাগলো, কিন্তু তারা সকলেই বারণ করলে, এই মরীচিকার পশ্চাতে নিষ্ফল দৌড় দিতে।

মনের নেশা বন্ধুর উপদেশ শোনে না, সে আপনিই হয়ে ওঠে উর্ব্বর, এবং অনেক আগাছা ও বনজঙ্গল সে সৃষ্টি করে আপনার ভূমির ওপর আপনার খেয়ালে। মনের নেশার চেয়ে মানুষের আর শত্রু নেই।

সে যে হঠাৎ একদিন অমিতাকে দেখতে গিয়েছিলো তার স্বামীর বাড়ীতে অযাচিত ভাবে,—তার স্বামীকে সে ঋণ দিল একেবারে এক হাজার টাকা অমিতার বিনা অনুরোধে,—ঋণ দি এতো আগ্রহ, এতো স্বয়ং-প্রবৃত্ততা,—এসবগুলোর মধ্যে যে একটি নস্তত্ত্বের কারিগরি ছিল, তা সে নিজেও সবটা বুঝে উঠতে পারেনি।

কিন্তু তব সে এগিয়ে পড়লো বানের জলের কুটার মতো। মানুষের দৌর্ব্বল্যও ঐখানে, সাফল্যও-ঐখানে। মানুষ দাস তার মনের কাছে। যে-মানুষ মনের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে, সে কি মানুষ? সে দেবতা হয়ে যায় কি না জানি না,—কিন্তু তার শক্তি সাধারণ মানুষের শক্তির সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে যে ঢের উপরে উঠে পড়ে, তার আর সন্দেহ নেই।

ধীরেন যে'দন নিজে অমিতা ও ঈশানবাবুকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলে দিয়ে এলো, সেদিন অমিতার অভিমান-কঠিন মুখখানা দেখে সে আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো হারাণো জিনিষ ফিরে পাবার জন্যে।

বাড়ী এসে সমস্ত সন্ধ্যাটাই কাটালে সে বিষণ্ণ, নির্জ্জন, হতাশ চিন্তায়। প্রাণটার মধ্যে খেলে গেল নিষ্ফল জীবনের কালো ছায়া। অনেকক্ষণ বসে বসে, অনেক ভেবে ভেবে, অনেক মতলব খাটালে সে।

তারপর মনকে ডুবিয়ে রাখার জন্যে বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় গিয়ে খেলা আরম্ভ করলে।

তারপর রীতিমত নিয়ম ক'রে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে সে ঈশানবাবুকে ও অমিতাকে সিমুলতলার ঠিকানায়। ঈশানবাবুর চিঠিগুলির উত্তর আসতো যথানিয়মে, কিন্তু অমিতাকে লেখা চিঠি উত্তরের মর্য্যাদা পেতো না। তবু এ অমর্য্যাদাটুকু গায়ে মাখবার অভিমান ধীরেনবাবুর মনে স্থান পেতো না। ওটা যেন স্বাভাবিক, এই রকম একটা ধারণা ধীরেন করে নিলো।

তারপর, দুর্নিবার মনের তাড়নায়, সে হঠাৎ একদিন চলে গেলো শিমুলতলায়। আগে হতে কিছু খবর না পাঠিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আসার কৈফিয়ৎ একটা মনে মনে ঠিক ক'রে নিলো। সেখানে যা ঘটলো, তা আগের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।...লজ্জার চরম বোঝা মাথায় নিয়ে ধীরেনবাবু আবার ফিরে এলো কলকাতায়।

কিছুদিন পরে ঈশানবাবুরও পত্র আসা বন্ধ হ'ল। ব্যাপারটা যে কি ধীরেন অনেকটা আন্দাজ করেছিল। শেষে সে ঠিক করলে, সিমুলতলাতে আর একবার যাবে।

যে-দিন রাত্রের গাড়ীতে সে যাবে, সেইদিন সকালে হঠাৎ একখানা চিঠি পেলে, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা। খুলে দেখলে, কাগজের ওপর কে মুক্তো ছড়িয়ে রেখেছে। লেখা আছে: 'আজ আমরা ফিরচি কলকাতায়; অসুখ বড় বেশী। ইতি অমিতা'। শুধু এইটুকু মাত্র; না আছে লেখিকার পত্রারম্ভে প্রীতি-সম্ভাষণ, না আছে সাধারণ কুশল-জিজ্ঞাসা। তবে সে লেখাগুলি যে অভিমানিনী নারীর হাতে লেখা, সেটা সে বুঝতে পারলে।

সিমুলতলায় আর যাওয়া হ'ল না। হাওড়া ষ্টেশনেই তাদের নামিয়ে আনতে গেল।

রেলগাড়ির পাদান থেকে প্লাটফরমে ঈশানবাবু সবে পা বাড়িয়েছেন এমন সময়ে কোথা হ'তে দৌড়ে এসে ধীরেন তাঁর বাম বাহুমূল ধরে বলে উঠলো: করেন কি, করেন কি? এখনই যে পড়ে যাবেন! এই অবস্থায় কারুকে না ধরে কি নামতে আছে?

গলার স্বর শুনে, ঈশানবাবু একেবারে চমকে উঠলেন। ফিরে তাকাতেই, তাঁর মনে হ'ল, তাঁর শরীরে যেটুকু রক্ত এখনও অবশিষ্ট আছে, সবটুকু একসঙ্গে জল হয়ে তাঁর ধমনী থেকে বাইরে ছুটতে চাইচে। মাথাটা কেমন বন্ করে ঘুরে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্মে বসে পড়লেন।

ধীরেন শশব্যস্তে বললে: কি হল? বসে পড়লেন যে? মাথা ঘুরচে বুঝি?

অমিতা গাড়ীর ভিতর একটি মুটেকে তাদের মোটগুলি দেখাতে ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে তার কাণে গেল ধীরেনের শেষ কথাগুলো।

সেও তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসে, হাতের পাথাখানি নিয়ে ঈশানবাবুকে বীজন করতে লাগলো। ধীরেন অমিতার হাত থেকে পাখাখানা একরকম ছিনিয়ে নিয়েই, নিজে হাত চালিয়ে খুব জোরে পাখা করতে আরম্ভ করলে।

'এখনও কিছু খাননি বুঝি?' ধীরেন অমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

অমিতা ধীরেনের দিকে না তাকিয়ে শুধু মাথা হেঁট করে বললে: না।

—কি ভয়ানক! এই এতো বেলা হ'ল, এখনও কিছু খেতে দাও নি? অমিতা? তোমার চারিদিকে চোখ খেলে,—আর এই দিকটা তুমি এমন চোখ বুজিয়ে কাজ করো! তাইতো, সঙ্গে একটু গরম দুধ টুধ আছে?

অমিতা পাষাণমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে। তার মুখে ভ্রু-দুটি অবধি একটু কুঁচ্‌কোলো না। সে শুধু বললে: এত সকালে ত উনি কিছু খেতে চান্ না। আর আজ গাড়িতে ··· ···

খুব জোরে পাখা চালাতে চালাতে ধীরেন বললে: আঃ! উনি যে রোগা মানুষ, অমিতা? আচ্ছা, দাঁড়াও দেখচি, এক কাপ গরম চা যদি পাই,···বলতে বলতেই সে পাখাখানা অমিতার হাতে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল, চা ওয়ালার সন্ধানে!

যেমন যাওয়া, তেম্‌নি আসা! হাতে একটা মাটির ভাঁড়ে গরম চা! ঈশানবাবুর কাছে হাঁটুর ওপর ভর করে বসে বললে: নেন এই গরম চা টুকু ঢ়ুক্ ঢ়ুক্ করে খেয়ে ফেলুন তো!

ঈশানবাবু তখন অনেকটা সামলেছেন! হাত নেড়ে বললেন: এখন থাক্। আমি এখনও মুখ ধুইনি!···আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি যে এই হতভাগার জন্যে ···

—ও পারিতোষিক বিতরণ পরে হবে'খুনি, ঈশানবাবু! আগে আপনি একটু সামলে নেন দেখি! এই গরম চা-টুকু···

চা' খেতে ডাক্তারে বারণ করেচে। ঈশানবাবু ক্ষীণস্বরে কথাটা জানালেন।

···বারণ করেচে? তবে থাক!···অমিতা? তুমি চা-টুকু খেয়ে নেবে নাকি?

নিশ্চল গাম্ভীর্য্যে অমিতা শুধু বললে: না!

—কেন? সকালেই একটু খেয়ে নাও না। গায়ে একটু জোর পাবে'খুনি।

—থাক্!

সেই পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তির দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য দেখে, ধীরেন আর বেশী কিছু বলতে সাহস করলে না। তার অপরূপ সৌন্দর্যে তার শরীরে শুধু একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল।

গম্ভীর তাচ্ছিল্যের মধ্যেও যে-সুষমা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তারই তাড়িত শক্তিতে ধীরেন মনে মনে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই, ঈশানবাবু মুখ তুলে বললেন: আপনি যখন আমাকে এত দয়া করচেন, ধীরেনবাবু, তখন একখানা গাড়িও ঠিক করে দিন আমার বাসা পর্য্যন্ত যাবার।

ধীরেনের এতক্ষণে হুঁস হলো। সে প্লাটফরমের ওপরেই চায়ের ভাঁড়টা রেখে, বললে: গাড়ি ঠিক করতে হবে না, ঈশানবাবু! বাইরে আমার গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে। তাইতেই আপনাকে বাসা অবধি পৌঁছে দেবো।

ঈশানবাবু চোখ বুজিয়ে বললেন: আপনি আমাদের যে উপকার কচ্চেন, এর ওপর আবার আপনার গাড়িখানা দখল করলে, আপনার ওপর বড্ড অত্যাচার করা হবে। সইতে পার্ব্বো না, ধীরেনবাবু, সইতে পার্ব্বো না এতো ঋণের ভার। তার চেয়ে আপনি দয়া করে, একখানা ভাড়া গাড়ি,—

ধীরেন ঈশানবাবুর হাতখানা ধরে বললে: ওসব লৌকতা রেখে আস্তে আস্তে আপনি চলুন দেখি!...যেতে পার্ব্বেন? না একটা পালকির বন্দোবস্ত কর্ব্ব বাইরে নিয়ে যাবার?

'না—না, আবার পালকি ? এই যে আমি যাচ্ছি ।' ব'লে ঈশানবাবু' ায়ের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়ালেন। অমিতা কাছে এসে মৃদুস্বরে জজ্ঞাসা করলে : সত্যি, যেতে পার্কে তো ?

ঈশানবাবু গলায় জোর করে বললেন : যেতে বসেছি, আর যেতে ার্কো না ? সব পারবো অমিতা। শুধু একটা পার্কো না, দেনা শাধ কতদূর কি হয়, বলতে পাচ্চি না।

শেষ কথাকয়টি এমন মৃদুস্বরে বললেন যাতে ধীরেনবাবু না শুনতে ায়! তবু ধীরেন শুনতে পেলে,—পেয়েও উচ্চবাচ্য কিছু করলে না। স অমিতার দিকে তাকিয়ে বললে : তোমার মোটগুলো গুণে নাও দখি ; আমি মুটের মাথায় চাপিয়ে দি।

একটা মুটে ততক্ষণে মোটগুলো গুছিয়ে মাথায় তুলতে আরম্ভ রেছে। অমিতা সে দিকে তাকিয়ে বললে : ঐতো তিনটে না চারটে মাট ! মুটেরাই দেখে শুনে নিয়ে আসবে'খুনি।

ধীরেন মুটের দিকে তাকিয়ে বললে : 'আচ্ছা চলো !' তারপর শানবাবুর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো।

(১৭)

অমিতা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলো নিরুৎসাহ অথচ ঢ়, নত-দৃষ্টি অথচ সতর্ক !

রক্ত-উঠা সিমুলতলাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই পুরাতন ষমন্,—সেই জ্বরটা,—আরও দ্বিগুণ মূর্ত্তি ধরে তাল ঠুকতে আরম্ভ রেছে। কলকাতায় আসবামাত্র ডাক্তার অনেক এলো, কিন্তু কউ প্রসন্নমুখে সাহস দিলে না।

ঈশানবাবু জ্বরেরঘোরে ভুল বকতেন, অমিতাকে সে সব শুনতে হোত। সে এক হাতে ওষুধের শিশি নিয়ে নাড়াচাড়া করতো, আর অন্য হাতে চোখের জল মুছতো। বিবাহিত জীবনের সমস্ত কথা ঠেলে এসে তার কণ্ঠ রোধ করে দিত।

ঈশানবাবু যে সকল ভুল বকতেন, তার মধ্যে ভুলও যতোটা, সত্যও ততটা মিশেল থাকতো। অমিতার কাণে এসে যখন সেগুলো পড়তো, তখন ভুলগুলো যেত উদ্বেগের মাত্রা বাড়াতে, আর সত্যগুলো যেত মনের উপর অবিনশ্বর ছাপ কুঁদে তুলতে।

জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল বকার মাঝখানে ঈশানবাবু যখন বলে উঠতেন: "ওগো, তোমার হাতে ধরে বলচি, আমার ঋণটা শোধ ক'রে দিও। নইলে,—"তখন অমিতার মন ভেঙ্গে পড়তো তার নিজের নিঃস্বতা স্মরণ করে,—উদ্বেল হয়ে উঠতো সে, কি উত্তর দেবে, তাই ঠিক করতে না পেরে।

স্বামীর প্রজ্বলিত উদ্বেগকে আপাততঃ শীতল কর্ব্বার জন্যে সে তাড়াতাড়ি বলতো: "ওগো, সেজন্যে ভেবো না; আমি যা করে পারি তোমার ধার শোধ করে দেবো",—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে হতাশ হ'ত তার প্রতিশ্রুতি পালন কর্ব্বার কতটুকু শক্তি আছে, তা হৃদয়ঙ্গম করে।

তখন বিবেকে আর আবেগে তুমুল দ্বন্দ্ব উঠতো তার মনের ভেতর. কিন্তু রুগ্ন স্বামীর দৃষ্টি আবার তাকে কর্ত্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যেত।

এমনি ক'রেই দিন কাটতে লাগলো তার একের পর এক, কিন্তু ঈশানবাবুর রোগ উপশমের দিকে কিছুতেই মুখ ফেরালো না।

অনেক ডাক্তার এল, অনেক কবিরাজ এল, ওষুধও এল সংখ্যায় ও পরিমাণে ঘর বোঝাই করে। টাকাও খরচ হতে লাগলো ছিদ্র-যুক্ত কলসীর জলের মতো। যতগুলি টাকা ঈশানবাবু ধার করেছিলেন

সবই খরচ হয়ে গেল চিহ্ন আর না রেখে। তবু তীরে উঠা দূরে থাক, অমিতা আরও গভীর জলে ক্রমশঃ এগুতে লাগলো।

(১৮)

—ধীরেনবাবু? আশা কি কিছু নেই?

—কে বললে? খুব আছে। এই তো ডাক্তার রায় ব'লে গেলেন,—

—মিথ্যে কথা বলে আমায় স্তোক দেবেন না, ধীরেনবাবু। আমি মিথ্যের ওপরে চলে গেছি!

—এই দেখো! তুমি জিনিষটা এমন ভাবে নিচ্ছ কেন অমিতা? আমি কি তোমার পর?

—পর কি আপন তা জানিনে। যারা আপন ছিল, তারা তো সব চললো। এখন পরই দেখছি আপন হবে।

ধীরেন কথাটা শুনে বেশ বিরক্ত হলো। বললে: আচ্ছা, অমিতা? তুমি কি কখনই আমাকে করুণ চ'খে দেখবে না? আমার মধ্যে কি এমন আছে, যেটা তোমার চোখে চিরকাল বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে? আমি কি কোনও দিন তোমার অপমান করেছি?

অমিতা হঠাৎ দৃপ্তা ফণিনীর মতো, ধীরেনের মুখের ওপর চোখ রেখে বললে: আপনি যদি কোনও দিন সত্যি সত্যি আমার অপমান কর্ত্তেন, তাহ'লে আমি এর চেয়ে ঢের স্বস্তিতে থাকতুম। কিন্তু তাতো আপনি কচ্চেন না,—আপনি যে তুষানল দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মারচেন! আজ আপনার জয়, আমার সম্পূর্ণ পরাজয়, সেটা কি আপনি বুঝতে পাচ্চেন না?

ধীরেন খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলো। কি সুন্দর তার মূর্ত্তি! সারসীর মত তার কণ্ঠ মৃণালের মত দুলছে! ভ্রূযুগে কি ভাবের তরঙ্গ! ধীরেন তিরস্কার খেয়ে পুরস্কার ব'লে মেনে নিল।

অমিতা পুনরায় বলতে লাগলো: কি? আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন যে? রাগ কচ্চেন না? আমি এতো গালাগালি দিচ্চি, তবু রাগ কচ্চেন না? আজ আমার স্বামী মরতে বসেছে, তাই বুঝি সুযোগ পেয়েছেন? বিপদের সময় বুঝি আমাকে হাতের মুটোর মধ্যে নেবেন? ওঃ! ওঃ!

বলতে বলতে অমিতা কেঁদে ফেল্লে। সে তার ডান হাত দিয়ে তার চোখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগলো।

ধীরেন সান্ত্বনা দিয়ে বললে: ও কি, অমিতা? তুমি কেঁদে ফেল্লে কেন আমি তোমায় কি বলেছি? তোমার কি অনিষ্ট করেছি? বরং তোমার স্বামী যাতে নীরোগ হয়ে উঠেন, তারই তো চেষ্টা করছি। তাতে তোমার অভিমান করবার কি আছে?

—কিছু নেই,—কিছু নেই! আপনি যান। আপনি আর আমাদের ঋণ বাড়াবেন না। আমার স্বামীকে একা একা বিনা তাদারকে, বিনা চিকিৎসায় মরতে দিন; তবু তাঁর ঋণ বাড়াবেন না। তিনি আপনার ঋণের জন্যে ভেবে ভেবে, শুখিয়ে শুখিয়ে মারা যেতে বসেছেন। আপনি কেন ঋণ দিয়েছিলেন? এখনও কেন ঋণ বাড়াচ্চেন? আপনার ঋণই এখন তাঁর প্রধান রোগ,—আর কোনও রোগ নেই।

ধীরেন ধীরভাবে উত্তর করলে: অমিতা? আমি ঋণ দিয়েছি সত্যি,—কিন্তু সেজন্যে কি তোমাদের কাছে কোনো দিন তাগাদা করেছি? কোনো দিনও নয়! তবে কেন তুমি আমার সঙ্গে অমন কচ্চ? তুমি মনে ভাবো না, আমি তোমাদের কোনও দিনই ঋণ দিই নি!

এমন সময় ঝি হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। বললে : মা ? শীগ্‌গির ও ঘরে চলো। বাবু কেমন কচ্চেন।

ঝিয়ের কথা শুনে অমিতা আর তিলমাত্র বিলম্ব করলে না ; তীরবেগে পার্শ্বের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখে, ঈশানবাবু ভয়ানক হাঁপাচ্চেন। তাঁর চোখ দুটো কপালে উঠে গেছে এবং তিনি শয্যার উপর একেবারে আছড়ে পড়ে আছেন।

অমিতা একখানি পাখা তুলে নিয়ে তাঁকে খুব জোরে হাওয়া করতে লাগলো। ধীরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিল, সে গ্লাস হ'তে একটু জল নিয়ে তাঁর মাথায় থাবড়ে দিলে। ঈশানবাবুর জ্ঞান ফিরতে বেশী সময় লাগলো না। অল্পক্ষণেই তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হ'লেন।

ধীরেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে : যাক, ভগবানকে ধন্যবাদ। ঈশানবাবু অনেকটা সুস্থ হ'লেন। অমিতা ? এই বিপদের মুহূর্তে তুমি আর আমার ওপর রাগ করে থেকো না।

অমিতা ঘাড় নত করে রইলো, কোনও উত্তর করলে না।

শুধু ঈশানবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন : অমিতা ? ধীরেনবাবুর ঋণ বড্ড বেশী বেড়ে যাচ্চে।

আর কোনও দিক থেকেই কোনও কথা এলো না। ধীরেন আরও খানিকটা অপেক্ষা ক'রে অপ্রতিভের মত বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

ঈশানবাবুর মাথাটা কোলের উপরে টেনে নিয়ে অমিতা তাঁর চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাচ্ছিল। পরম তৃপ্তিতে ঈশানবাবু চোখ বুজিয়ে ছিলেন আর গল্প কচ্ছিলেন।

অমিতা ? মরবার সময়েও আমি শান্তি পেয়ে মলুম না।

আবার ঐ সব কথা আরম্ভ করলে ? অন্য কথা বলো।

ঈশানবাবু বললেন : অন্য কথা ? অন্য আর কোনও কথা যে আমার নেই, অমিতা ! আমার সব কিছু যে ঐতেই মিশে গেছে। ছেলেবেলায় যখন পাঠশালায় পড়তুম, তখন শিখেছিলুম, কখনো ঋণ করতে নেই, ঋণ বড় খারাপ জিনিষ। বয়স হলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম জীবনে কখনো ঋণ কর্ব্বো না। আমার বাবা কখনো ধার কর্ত্তেন না ; ধার করাকে তিনি ঘৃণা কর্ত্তেন। কেন জান অমিতা ?

কেন ?

আমার জ্যেঠামশায় চোখের ওপর সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন, ধার করে। শুধু সর্ব্বস্বান্ত হননি, তাঁর মৃত্যুও এক রকম ধারের কারণে। পাওনাদারদের তাগাদার জ্বালায় তিনি একদিন গলায় দড়ি দিয়ে অপমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেন। ঋণের অপমান বড়ো অপমান, অমিতা।

অমিতা জিজ্ঞাসা করলে : তুমি তাঁকে দেখেছিলে ?

দেখেছিলুন বৈ কি ! আমার এখনও তাঁর চেহারা চোখের ওপর ভাসে। তাঁকে দেখেছি, জ্যেঠাইমাকেও দেখেছি। আর দেখেছি,—উঃ ! সে কথা এখন মনে হ'লে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তুমি

বিশ্বাস করো, অমিতা, যে আমার জ্যেঠাইমা তাঁর সর্ব্বস্বান্ত হবার পর দোরে দোরে ভিক্ষে কর্ত্তেন? তুমি বিশ্বাস করো, আদালতের পেয়াদারা আমার জ্যেঠাইমাকে বে-ইজ্জত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়?

অমিতা কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেঃ কেন, বে-ইজ্জত করলে কেন?

ঈশানবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলতে লাগলেনঃ কর্ব্বে না? পাওনাদারেরা তাঁর বাড়ী নিলেম করে নিয়েছিল! তারা সে-বাড়ী দখল কর্ব্বে না?

অমিতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেঃ দখল কর্ব্বে ত বাড়ীর মেয়েদের বে-ইজ্জত কর্ব্বে কেন?

ঈশানবাবু ফিক্ ক'রে একটু হাসলেন। সেটা বড় মর্ম্মান্তিক হাসি! পরে বললেনঃ

জ্যেঠাইমা যে বোকা! এক কথায় বাড়ী ছেড়ে দিলেই হতো। তাতো তিনি দিলেন না। তিনি জিদ্ ধরলেনঃ আমার শ্বশুরের বাড়ী, আমি কিছুতেই ছাড়বো না। হি—হি! তা কি আর হয়, অমিতা? তোমার শ্বশুরের বাড়ী বলে পাওনাদার ছাড়বে কেন? তোমার সে-বাড়ীর ওপর একটা পবিত্র শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু পাওনাদারের কাছে সেটা কি? সেটা একটা টাকার তোড়া বইতো নয়! পৃথিবীতে টাকাই সব, এটা তো জ্যেঠাইমা জানতেন না,— তাই নেড়ে পেয়াদার গলাধাক্কা খেয়ে শেষে বাড়ী ছাড়লেন!

—তা, তোমরা কিছু করলে না?

—করলুম বৈ কি। আমার বাবাই তো নিজের অংশের বাড়ী বেচে সে বাড়ী উদ্ধার করলেন। কিন্তু সে কদ্দিন? দুদিন যেতে না

যেতে তিনিও বুঝলেন, যে ডুবছে তাকে উদ্ধার করতে যাওয়া মানে আপনিও ডোবা। জ্যেঠাইমাকে বাড়ী উদ্ধার করে বাড়ীতে বসালেন বটে, কিন্তু আর এক পাওনাদার এসে আবার সে বাড়ী নিলেম করালে। তখন আবার যে পথে জ্যেঠাইমা সেই পথে! তখন শুধু জ্যেঠাইমা একা নয়, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথী হয়ে রাস্তায় দাঁড়ালাম। আজও সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।

অমিতা স্বামীর মুখে তাঁদের সংসারের ইতিহাস শুনে বড় অন্যমনস্ক হ'ল। তার চোখ দুটোও ছল ছল করে উঠলো। সে একসময় আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে নিলে।

সে হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করলে: তোমার জ্যেঠামশায় এত ঋণ করেছিলেন কেন?

—সেও এই ইতিহাস, অমিতা, এই ইতিহাস সেও এই যক্ষ্মারোগ! আজ যে-রোগে আমি ঋণী, তিনিও সে রোগে ঋণ করেছিলেন। তবে আমি ঋণী আমার নিজের রোগে, আর তিনি ছিলেন ঋণী তাঁর ছেলের রোগে। তাঁর বড় ছেলে পাঁচ বচ্ছর এই রোগে ভোগে। ছেলের স্নেহে জ্যেঠামশায় কলকাতায় বড় বড় ডাক্তার, বড় বড় কবিরাজকে দিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, বড় বড় সাহেব-ডাক্তার আসচে তাঁর বাড়ীতে। নার্স দিনরাত থাকতো রুগীর সেবায়। তিন বচ্ছর ছেলেকে রেখে দেন মাসে এক হাজার টাকা খরচ করে, সেই সুদূর শৈল-নিবাস মুসৌরিতে। এ সব খরচ ধার কোরে, বুঝলে অমিতা! সব ধার করে! যেমন আজ আমিও ধার ক'রে,—

বলতে বলতে ঈশানবাবু আর বলতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

অমিতা মাথা নীচু করে রইলো। •তার গাল বয়ে অনেক অশ্রুর মালা তাকে সহানুভূতি কচ্ছিল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা কইলে না। কিন্তু ঈশানবাবু ছাড়লেন না; তিনি খানিক পরে আবার আরম্ভ করলেন: শুধু কি তাই? শুধু কি বড় ছেলে গেল? সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আত্মহত্যা করলেন, জ্যেঠাইমাও পথে এসে দাঁড়ালো। তার ওপর ঋণের জেরে তাঁর ছোট ছেলে, —এক মাত্র ছেলে,— সেও জেলে গেল, চোর বাটপাড়দের মত ঘানি টানতে।

—জেলে গেল? কেন জেল হ'লো কেন? অমিতা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—ছোট-ছেলে নাকি তখন সাবালক ছিল। জ্যেঠামশায়কে যখন কেউ আর ধার দেয় না, তখন ছোট-ছেলের নামে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে তিনি নাকি কার কাছ থেকে টাকা ধার করেন। তারা শেষে নালিশ করলে। ছোট-ছেলে টাকা শোধ দিতে পারে না। তারা করলে বডি-ওয়ারেণ্ট। পাকড়াও করে একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে তারা পূরলে জেলে। বস্! ভদ্র লোকের চূড়ান্ত হয়ে গেল!

—জেল? টাকা ধার করার জন্যে মানুষের জেল হয়? অমিতা কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলে।

—হয় বৈ কি! না হ'লে আমার জাটতুতো ভাইয়ের জেল হল কেন? ঋণের জন্য সব হয়। অমিতা, সব হয়।

অমিতার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল; সে একটা ঢোক গিলে, অতি ভীত-ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে: তাহ'লে আমাদেরও যে টাকা ধার করা হয়েছে, তা না দিতে পারলে,—

• ঈশানবাবু বিনা বাধায় উত্তর দিলেন: আমারও জেল হবে অমিতা! আর আমি যদি এর ভেতর পৃথিবীর জেল থেকে ছুটি পাই,—

অমিতা অন্তর্ভেদী উদ্বেগের সহিত শুনতে লাগলো; ঈশানবাবু বলে যেতে লাগলেন: তাহ'লে তোমায় ধরবে পাওনাদারে। হয়তো তোমায় আদালতে দাঁড় করাবে। আমি দেখতে আসবো না, কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা কতো বড়ো নির্লজ্জতা, তা মনে হ'লেও আমার এই অর্দ্ধেক শুকিয়ে-যাওয়া হৃৎপিণ্ড যেন আরও শুকিয়ে যায়, রক্ত-চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তুমি সে অপমান কি সহ্য করতে পারবে, অমিতা?

অমিতা সে কথা শুনে ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো: ঈশানবাবুর কথার উত্তর দেবে কি, তার মনের ভেতর কথা কইবার শক্তি পর্য্যন্ত গোলমাল হয়ে গেল। আদালত ও জেলের একটা হিংস্রক মূর্ত্তি তার কল্পনায় ভেসে উঠলো।

ঈশানবাবু আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন: কি ক'রেই বা তুমি পাওনাদারকে মেটাবে? আমার বাড়ী ঘর দোর নেই যে তা বেচে তুমি তাদের ঋণ পরিশোধ কর্ব্বে। কিছু নগদ টাকাও রেখে যাচ্চি না যে, ধার শোধ করতে তোমার উপায়ের অভাব হবে না! যদি জীবন-বীমাও কিছু থাকতো, তাও নেই! গয়না-গাঁতি-গুলোও তো সব নষ্ট করলে আমার এই বিশ্ব-গ্রাসী রোগের নিঃশেষ জঠরে! আর কি দিয়ে তুমি সে অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে? নাঃ! ভুল কর্লুম, অমিতা, বড় ভুল কর্লুম! হঠাৎ আত্মরক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, আশায় আশায় তোমায় ঋণের মাঝখানে ডুবিয়ে রেখে গেলাম। নাঃ! আমার মরেও সুখ নেই, অমিতা, মরেও সুখ নেই!

ঈশানবাবু হঠাৎ বড় ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগলেন। অমিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

(২০)

মন আছে ত বেশ আছে। কিন্তু একবার যদি তাকে কোনও গভীর খালের মধ্যে বহিয়ে ফেলা যায়, তাহ'লে তার সমস্ত বৃত্তিগুলি একজোটে এসে পড়ে সেই খালে। দুশ্চিন্তা একবার মনের খালে বহিতে আরম্ভ কর্লে, সেটা হয়ে উঠে একেবারেই দুর্বার!

অমিতা ঋণের ফলাফল শোনা অবধি কেবলই চিন্তা কর্ত্তে লাগলো ঐ সব কথা! রোগীকে সেবা কর্ত্তে কর্ত্তে সে বসে বসে ভাবে, কেমন ক'রে সে এই ভবিষ্যতের কালান্তক যমের হাত থেকে এড়িয়ে থাকবে। তার ভোজনে, শয়নে, বিরামে, পরিশ্রমে ঐ একই চিন্তা সাপের বিষের মত তাকে পীড়ন করতে লাগলো।

ধীরেন মাঝে মাঝে আসে তাদের বাড়ীতে তাদের খোঁজ নিতে। কিন্তু তাতে কেউ-ই সন্তুষ্ট নয়। ঈশানবাবু তাকে দেখলেই ভয়ে আঁতকে উঠতেন। কিন্তু ধীরেন এসে তাঁর বিছানার পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনাও দিয়ে যেতো। অমিতা প্রায়ই সে সময় সে ঘর থেকে পালিয়ে অন্য ঘরে বসে থাকতো।

কেবলই তার মনে হোত, ধীরেন বুঝি এসেছে তার পাওনা টাকা চাইতে। তার রাগ হয়ে উঠতো তার ওপর. কেন সে চাহিবামাত্র টাকা ধার দিয়েছিল। টাকা ধার না দিলে তো তাদের দুজনকে এতো ঋণের ভাবনায় পড়তে হোতো না। ঈশানবাবুকে হাওয়া খাইয়ে আনা হোতো

না ? নাই হোতো ! হাওয়া খাইয়ে তাঁর কি উপকার হয়েছে ? তিনি তো ক্রমশঃই আরও খারাপের দিকেই নেমে যাচ্ছেন ! আজ তাঁর যে অবস্থা, তাতে আশাতো অমিতা মোটেই করতে পারে না, বরং তার মনে হচ্ছিল, সে ভয়ানক-দিন বুঝি অতি নিকটে এগিয়ে এসেছে। হাওয়া খাওয়ার ঋণটা তো একেবারেই বাজে গেল ! অমিতা, এই সব কথা ভেবে ধীরেনের ওপর আরও রেগে উঠতো।

এমন সন্দেহও তার মনে মাঝে মাঝে আসতো, বুঝি ধীরেন ইচ্ছে করেই এই পাষাণ তাদের বুকে চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে ! ডাক্তারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই হয়তো সে তাদের হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিল ! এমন কি হয় না ? অমিতা ভাবতো, হতেও পারে ! ধীরেন যে এখনও অমিতার ওপর অন্যায় অনুরাগের দাবি চালাচ্ছে, সেটা অমিতা বেশ বুঝতে পারতো। ধীরেনের কথাবার্তা, তার দিকে বাঁকা চাহনি, অযাচিত ঘন ঘন আগমন, শিমূলতলায় হঠাৎ গিয়ে সেই-সব সেলেঙ্কারি, সব যেন তাকে বলে দিতো, ও-লোকটা এখনও তার আশা ছাড়ে নি। তবে কি ধীরেনের আরও কু মতলব আছে ? আশ্চর্য্য নয় ! এমন তো অনেক ঘটে ; তার বেলায়ই যে ঘটবে না, এমন বা কি মানে আছে ?

যাহোক, অমিতা কিছুতেই ধীরেনের ঘন ঘন খবর নেওয়ায় নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার লক্ষণ খুঁজে পেতো না। রেগে রেগে সে মরতো, কিন্তু নীরবে। অভিযোগ কর্বার সাহস তার ছিল না, বারণ কর্বারও না। কপালের উপর নির্ভর করেই সে সব সহ্য করতে লাগলো।

সেদিন আমাবস্যা। আকাশও সেদিন ভেঙ্গে পড়ছিল পৃথিবীর ওপর। সকাল থেকে যে ঝড়-বৃষ্টি স্বরু হয়েছে, অপরাহ্নেও তা

বন্ধ হয়নি। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তারবাবু এলেন; এসে এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন যে অমিতা তা দেখে, শেষ সর্ব্বনাশের ইঙ্গিতে চমকে উঠলো। ঈশানবাবুও সেদিন বড় ভুল বকছিলেন; কেবল সেই টাকা ধারের কথা, আর কেবল সেই সর্ব্বশেষে পরোপকারীর ঋণ শোধের কথা। জ্বরটাও খুব বেড়ে উঠেছিল।

ডাক্তারবাবুকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হ'ল না, ডাক্তারবাবুও কোন কথা আপনা হতে বলে গেলেন না। কি একটা ওষুধ কাগজে লিখে দিয়ে তিনি বৃষ্টি-বাদলায় অজুহাত দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন। অমিতা বুকটা চেপে ধরে আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে।

তারপর কি ভেবে, মাথা নাড়া দিয়ে সে এসে বসলো ঈশানবাবুর পাশে। ঈশানবাবু চমকে উঠে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলেন; তারপর কি একটা ভুলের ঝোঁকে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন: 'ধীরেনবাবু? কেন অনবরত আমার কাছে আসচো? তোমার টাকা তো আমি অমিতার কাছে রেখে দিয়েচি···তার কাছ থেকে নাওগে। ···আমার কাছে কেন?' অমিতা তাঁর কপালে খানিকটা জল ছিটিয়ে বললে: ওগো অনবরত ভুল বকচো কেন? আমি ধীরেনবাবু নই, আমি তোমার অমিতা!

—ভুল বক্‌চি? কথ্‌খনো নয়! আমি ঠিক বলচি। অমিতা তার বুকের ভেতর টাকা লুকিয়ে রেখেছে!···তার কাছে যাও!···সে দেবে!

অমিতা বললে: ওগো, হাঁ, হাঁ! আমার কাছে টাকা আছে! তাকে দেবো'খন। তুমি একটু চুপ কর দেখি!

—হাঁ টাকাটা দিয়ে দিও, অমিতা! এটা আমার শেষ অনুরোধ! খবরদার, চুরি করো না! করলে, আমি যেখানে যাচ্চি, সেখানকার

গাড়িভাড়া পাবো না! আমাকে জেলে পূরবে,—জেলে! তোমায়ও পূরবে, আমায়ও পূরবে। টাকাটা দিয়ে দিও, লক্ষ্মীটি সোনাটি!

ঈশানবাবু তখন নিশ্চিন্ত ভাবে পাশ ফিরলেন; অমিতাও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

এমন সময়ে হঠাৎ সেই দিককার দরজা ঠেলে ধীরেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। দরজা খোলায় বোধ হয় একটু শব্দ হয়েছিল। ঈশানবাবু সেই শব্দে হঠাৎ চোখ খুলে একেবারে লাফিয়ে উঠে বললেন: পেয়াদা এয়েচে, পেয়াদা এয়েচে! পালাই, পালাই! অমিতা, সরো সরো!

যেমনি এই চিৎকার, অমনি একটা ভয়ঙ্কর কাশি এলো। আর রোগীর মুখ থেকে ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হতে লাগলো। মূর্চ্ছা গেল, ঈশানবাবুও সঙ্গে সঙ্গে শয্যার উপর ধড়া করে পড়লেন। অমিতা চিৎকার করে উঠলো।

বাহিরেও কক্কড় কোরে একটা বাজ ডাকলো। ঝড়ের দাপটে বাড়ী-ঘর-দোর যেন ভেঙ্গে পড়বার মত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হলো করকাপাত!

অমিতা এক সময়ে তার কান্না থামিয়ে ধীরেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে: ওগো, একবার দেখোনা, উনি কথাবার্ত্তা কচ্চেন না কেন?

ধীরেন দাঁড়িয়েছিল নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! অমিতার কথায় সে চমকে উঠলো। ঈশানবাবুর দিকে আর একটু এগিয়ে এসে, দেখে বল্লে: একি, ইনি যে মোটে নড়চেন চড়চেন না।

অমিতা বললে: আর নড়েচেন!

সে কেঁদে উঠে মৃত স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়লো।

বাহিরে আবার একটা বাজ পড়ার শব্দ হলো।

(২৮)

প্রায় তিন মাস কেটে গেছে, ধীরেন তারপর থেকে আর একদিনও অমিতার বাসায় যেতে সাহস পায়নি। মৃত্যুর যে বিভীষিকাময় মূর্ত্তি সেদিন সে দেখে এসেছিল, সেটা যেন অনবরতই তার চোখের সামনে এসে পড়তো, যখনই সে পা বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করতো সেই দিকে!

সময়, বিভীষিকার নগ্নমূর্ত্তি পাঁচরকম আবরণীতে ঢাকা দিয়ে অনেকটা সুসহ করে আনে। ধীরেনেরও তাই হ'ল। সে ক্রমশঃ সাহস পেলে, একবার অমিতার গৃহে গিয়ে তার খোঁজ খবর নিতে।

একদিন অপরাহ্ণে সে গেল অমিতার বাসায়। তার বাসার সম্মুখে এসে দেখে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কড়া না নাড়লে যে কেউ দরজা খুলে দেবে না, সেটা সে জানতো: কিন্তু তবু কড়াটা হাতে ধরে নাড়তে তার যেন ঘাম ছুটতে লাগলো। সে খানিকটা দরজার চৌকাঠে বসে রইলো।

ঘাম-ছোটা যখন অনেকটা কম হ'ল তখন সে বুকে জোর এনে কড়াটা নেড়ে দিলে। ভিতর থেকে রমণীকণ্ঠে প্রশ্ন এলো: কে গা কড়া নাড়ে? ধীরেন অতি সন্তর্পণে উত্তর দিলে: আমি,, ধীরেন গলার স্বর এত ক্ষীণ যেন সে কতদিন কিছু খায় নাই।

দরজা খুলতেই চোখে চোখে চাহনি হ'ল। ধীরেন সম্ভ্রমে চোখ

নামিয়ে নিলে। কিন্তু অমিতা বেশ উদাসীনের মত বললে: টাকা চাইতে এসেছেন বুঝি?

—না, অমিতা, টাকা চাইতে আসিনি।

তবে?

—এমনি তোমাকে দেখতে এলুম। তুমি কেমন আছ?—

—ওঃ! তবু ভাল! আমি ভেবেছিলুম, টাকার স্থদ নিতে আসা ছাড়া আপনার এখানে আর কোনো কাজ নেই! তা এসেছেন, বেশ করেছেন, ভেতরে এসে বস্থন!

এই বাঁকা বাঁকা শ্লেষোক্তি ধীরেন অন্য সময় হ'লে কতটা জীর্ণ করতো বলা যায় না, কিন্তু আজ তাকে চুপ করেই সহ্য করতে হোলো। অমিতার জিবে সৌন্দর্য্য নেই একথা ধীরেন অনেক দিনই জানে, কিন্তু তার মুখের অলৌকিক সৌন্দর্য্য যে তার সব দোষকে [illegible]লি দিয়ে মুড়ে রেখেছে! যে অতো স্থন্দর, তার মুখে দুটো [illegible]ক্কার শোনা কি একেবারেই অসহনীয়?

ধীরেন নীরবে অমিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে তার ঘরের মধ্যে এসে বসলো। ঘরের মাঝখানে একখানা প্রাচীন কেদারা ছিল, সেইটাতেই সে অন্যমনস্কভাবে এসে স্থান অধিকার করলে। সমুখে একখানা চৌকি ছিল, সেইটাতে বসলো অমিতা।

ধীরেন ধীরস্বরে বললে: অমিতা? আজ তুমি আমায় এত বড়ো গালাগালিটা দিলে কেন? আমি কি শুধু টাকার জন্যেই তোমার কাছে আসি?

তীক্ষ্ণবাদিনী অমিতা বললে: যদিই টাকার জন্যে এসে থাকেন, সেটা কি বড়ো অন্যায় কাজ করেছেন? কোন্ পাওনাদার ঋণীর কাছে টাকার তাগাদায় না আসে?

—আমি বড় দুঃখিত হলাম অমিতা। আমি তোমার এতো করেও, তোমার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারলুম না যে আমি ঠিক কুশীদজীবীর মতো তোমাকে টাকা ধার দিইনি। আমি তোমার বিপদে তোমাকে সাহায্য কর্ব্বার জন্যেই,--

—কারণটা আমার জানবার দরকার নেই, ধীরেনবাবু! আপনি যে আমাদের টাকা ধার দিয়েছিলেন এজন্যে আমার স্বামী আপনাকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়েছেন; আর তিনি বরাবরই জানিয়েছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা অকপট চিত্তে! আর তাঁর কল্যাণেই আমার কল্যাণ! কাজেই আমিও আপনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কিন্তু আরও আমাকে সময় দিতে হবে, ধীরেনবাবু। আমি এখনও আপনাকে এ টাকা পরিশোধ করতে পারচিনে!

ধীরেন এবার মুখটা একটু তুলে বললে: পরিশোধের কথা তুলচো কেন অমিতা? আমি কি তোমার কাছে টাকা চেয়েচি?

—না চাননি। সেটা আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু আপনার মহত্ত্ব যতো ওপরে উঠচে, আমার নীচত্ব ততো নীচে নেমে যাচ্চে, আপনাকে টাকাটা পরিশোধ না করে। আমার স্বামী মৃত্যুর সময় বারবার ক'রে বলে গেছেন, আপনার ঋণটা শোধ ক'রে দেবার জন্যে। তাঁর অন্তিম সময়ের আজ্ঞা আমি অপালন কর্ব্বো না, ধীরেনবাবু, এটুকু বিশ্বাস আমায় করুন।

ধীরেন হঠাৎ আপত্তির উত্তেজনায় বলে উঠলো: অমিতা,—অমিতা?—

—কি বলচেন বলুন। বলতে বলতে থামলেন কেন?

ধীরেন মাথাটি নামিয়ে বললে: তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

অমিতার মুখখানা রক্তিমবর্ণ হ'তে হঠাৎ একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্বর নামিয়ে সে বললে : পড়ে !

—অমিতা, সে-সময় তুমি কিন্তু এতটা রুক্ষ ছিলে না। আজ তোমার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষতাটাও একটু বেড়ে গেছে। অন্ততঃ আমার ওপর।

অমিতার মুখে আবার রক্তিমাভা ফিরে এলো! সে বললে : আজ কি এই কথাটা বলবার জন্যে আপনার এইখানে আসা ?

ধীরেন আপনাকে সামলে নিয়ে বললে : আমার আজ এখানে আসা যে কি জন্যে, তা আমি নিজেই ভাল বুঝে উঠতে পাচ্চিনে; তা তোমাকে কি বোঝাব ? কিন্তু আমার আশা ছিল, তোমাকে আমি না বোঝালেও, তুমি সেটা বুঝে নেবে। ··কিন্তু দেখছি, আমার সে আশা অমূলক।

ধীরেনবাবুর কথা শুনে অমিতা বড় সঙ্কুচিত হয়ে গেল! তার প্রগল্ভ ভাব লজ্জার আড়ষ্টতায় চাপা পড়লো! সে বললে : আমি··· বুঝতে পেরেছি ধীরেনবাবু! শুধু আজ কেন, অনেকদিনই আমি তা বুঝেচি। কিন্তু তা হবার নয়।

কেন ? বিধবাবিবাহ ত আজকাল অনেকেই কচ্চেন।

অমিতা স্থিরভাবে বললে : তা কচ্চেন। কিন্তু আমি তা কর্ব্বো না! আমি এখন আমার ঋণ কি ক'রে পরিশোধ কর্ব্বো, সেই ভাবনা নিয়েই আছি। ও সব কথা আমাকে এখন বলবেন না!

ধীরেন হতাশ হয়ে পড়লো। তার শেষ আশাটুকু, যেটুকু উর্ব্বর ভূমি পেয়ে শিকড় বেঁধেছিল, সেটুকুও আল্‌গা হয়ে গেল। সে মাথা নত করেই রইলো।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়া কোন্ সময় চোরের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে

আরম্ভ করেছে, তা দুজনার কেউ জানতে পারে নাই। নীরবতার মধ্যে ঘড়িতে ঠং ঠং করে সাতটা বাজলো! অমিতা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে: আমি এখন আসি ধীরেনবাবু। আমার অন্য কাজ আছে।

ধীরেন অনেক সাহস করে মুখ তুলে বললে: তাহ'লে একান্তই আমায় নিরাশ হয়ে যেতে হলো?

অমিতা দৃঢ়ভাবে বললে: হাঁ, একান্তই!

ধীরেন একেবারে দমে গেল। কিন্তু তবু একবার শেষ চেষ্টা কর্ব্বার জন্যে বললে: আমি তোমার স্বামীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ ক'রে দিচ্চি। সেই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোটখানা তোমার সুমুখেই ছিঁড়ে ফেলচি।...তার পরিবর্ত্তে তুমি আমার হও অমিতা! আমি তোমার জন্যে যে কি না করতে পারি, তা জানো না! আমি এখনও বিয়ে করিনি, শুধু তোমার আশায়। আমার এ আশা পূর্ণ কর্ব্বে না, অমিতা?

অমিতা রুষ্ট হয়ে উঠলো। বললে: এ সব কথা বলতে আপনার মুখে বাঁধছে না, ধীরেনবাবু?

ধীরেন কিন্তু কোথা থেকে তার উত্তর খুঁজে পেলে, সেটা বিস্ময়ের বস্তু! সে বললে:—না, বাঁধছে না। তার কারণ, আমার সব বাঁধন আল্‌গা করে দেছে তোমার নেশা! ছেলেবেলা থেকে,—আমার প্রথম যৌবন থেকে,—তোমার রূপের মদ আমি পান করেছি। তার নেশা একটু একটু ক'রে অনেকটাই জমে উঠেচে। অপর কেউ হ'লে হয়তো এ নেশায় পাগল হয়ে যেতো! হয়তো আত্মহত্যা করতো! কিন্তু আমি এখনও ঠিক আছি। এটা আমারই বাহাদুরি। কিন্তু এর জন্যে কি শেষে এই পুরস্কার পেলুম অমিতা?

ধীরেনবাবুর কথা শুনে, ও তার কোমল মার্জ্জনা-পেলব মুখভঙ্গি

দেখে অমিতা অনেকটা নরম হয়ে গেল। তার জন্যে সে মনে মনে একটু ব্যথাও অনুভব করলে। জিহ্বা সে সংযত করে ফেল্লে ও পরে বললেঃ ধীরেনবাবু, আমি হাতজোড় ক'রে আপনাকে বলচি, আমায় মাপ করুন। আমি তা পার্ব্বো না।

সুযোগ বুঝে ধীরেন জিজ্ঞাসা করলেঃ কেন? আপত্তি কি অমিতা?

অমিতা তেমনি নরম স্বরেই উত্তর দিলেঃ এটা আপত্তি কি বিপত্তির কথা নয়, ধীরেনবাবু, এটা মনের কথা। আমার মন, আমার স্বামীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সেখানে অন্য কারুর দাবি সূচ গলাতে পার্ব্বে না। যদি কখনও সেখানে ফাঁক আসে, তখন কি কর্ব্বো, তা বলতে পারি নে। কিন্তু আজ—

অন্ধকারে কোথায় একটা ক্ষীণ দীপের আলো ধীরেন খুঁজে পেলে, তা সেই জানে। সেই আলোকের পশ্চাতে ছুটে সে বললেঃ তাহ'লে একদিন হয়তো আমি আশা করতে পারি?

না, তাও পারেন না।

কেন?

পারেন না এইজন্যে, যে, আপনার সঙ্গে আমার মনের মিল কখনই হতে পারে না। আপনি পাওনাদার, আমি ঋণী। আমি আপনাকে ইদানীং ভয়ের চোখেই দেখে আসচি। যাকে ভয় করি, তাকে ভালবাসবো কি ক'রে? জোর ক'রে কি মানুষকে ভালবাসা যায়?

যদি বলি, তোমার কাছে আমার আর টাকা কড়ি কিছুই পাওনা নেই?

অমিতা চোখ তুলে বললেঃ নেই? নিশ্চয়ই আছে। আপনি

নেই বললে অমনি হবে? যেটা সত্যি, সেটা কখনও মুখের কথায় মিথ্যে হয়?

ধীরেন বললে: আমিই তো পাওনাদার, আমি লিখে দিচ্চি, আমার টাকা শোধ হয়ে গেছে।

অমিতা বিস্মিতা হয়ে বললে: আপনি এতগুলো টাকা, আমার জন্যে একেবারে ছেড়ে দেবেন?

ধীরেন অম্লানবদনে উত্তর দিল: হাঁ, তা দেবো অমিতা! জীবনে টাকাটাই সব নয়; তার ওপরেও আর একটা জিনিষ আছে। সে জিনিষটা টাকা দিয়েও মানুষ অনেক সময় কিনতে পায় না। আমার বাবা আমার জন্যে অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন। সেগুলো নিয়ে আমি শুধু শতকে গুণি, কিন্তু মনের ধারাপাতের একটা অঙ্কও খুঁজে পাই নে। তোমার জন্যে আমার মন অনেক দিন অস্থির! তুমি আমার হও, তার বদলে আমি তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে দিচ্চি।

অমিতা চমৎকৃত হয়ে গেল ধীরেনের কথা শুনে। তার বিষয়ে তার যে একটা প্রতিকূল ধারণা ছিল, সেটা যেন বড় লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল আপনার আবরণের মধ্যে। একটা আত্মবিদ্রোহী গ্লানি এসে জমলো অমিতার মনের মধ্যে।

সে মনে মনে ধীরেনের যথেষ্ট প্রশংসা করলে, কিন্তু তবু তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়াটাকেও সে আত্ম-অবনতির চরম ব'লে অনুভব করলে। সে উত্তর দিলে: আপনি যে এতো মহৎ, তা জানতুম না, ধীরেনবাবু! টাকার চেয়ে যে আপনি মানুষের মনুষ্যত্বকে বেশী পূজো করতে শিখেচেন, এত বড়ো উদার প্রাণ আপনার, আগে খবর পাইনি। এ খবর জানলে আপনাকে এতকাল ধরে আমি কটুকথা,

অবহেলার ভাব দেখিয়ে আসতুম না। এ সব আমার অন্যায় হয়েছে; শুধু অন্যায় নয়, ঘোর পাপ হয়েছে। আমায় ক্ষমা করুন। আর এ প্রস্তাব বিষয়েও আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার যোগ্য নই।...

কেন? তোমার আপত্তি যা, তা'তো আমি মিটিয়ে দিলুম।

না, মেটে নি। আপনি টাকা পেয়েচি বলে লিখে দিলে আমার স্বামী হয়তো ঋণমুক্ত হতে পারেন, কিন্তু আমার যে ঋণ আছে স্বামীর কাছে, সেটা তো শোধ করা হ'ল না। আমার স্বামীর মৃত্যুশয্যায় আমি স্বীকার করেছি, আমি যা করে পারি, তাঁর ঋণ শোধ করে দেবো। কই, আমার তো শোধ করা হ'ল না?

কেন, আমি টাকা দিচ্চি, সেই টাকায় শোধ করে দাও।

অমিতা ফিক্ করে একটু হাঁসলে। শাদা থানকাপড়ের প্রতিফলকের উপর যে চাঁপাফুলের মত গৌর মুখখানি চল চল কচ্ছিল, তার ওপর শাদা বুদবুদের মত হাঁসিটি বড় চমৎকার লাগলো ধীরেনের। কিন্তু তবু কি তীক্ষ্ণ সে মধুরতা! যেন শাণিত সোণার তরবারি!

অমিতা হেঁসে বললেঃ তা হয় না ধীরেনবাবু! সত্যকে আমি অত সহজে অপলাপ করতে পার্ব্বো না। যেটা সত্যি, সেটাকে মিথ্যের দড়ি দিয়ে গলা টিপে মারা যায় না। মনকে চোখ ঠেরে কোন বড় কাজ সিদ্ধ হয় না। আমায় মাপ করুন। না, না, আমায় মাপ করুন। আমি চললুম। আমাকে আর প্রলোভনের মধ্যে ফেলবেন না।

অমিতা আর ক্ষণমাত্র সেখানে দাঁড়াল না; তীরের মত ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

ধীরেন চেঁচিয়ে ডাকলেঃ অমিতা, অমিতা? কোনো উত্তর নেই। পাশের ঘরের দিকে গিয়ে বন্ধ দরজায় আঘাত করলো, কিন্তু তবু দরজা খুললো না, অমিতা কোন সাড়া দিল না।
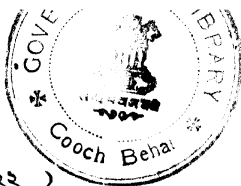
(২২)

ধীরেনবাবু যখন একান্তই নিরাশ হয়ে অমিতার বাড়ী থেকে চলে গেল, তখন অমিতা তার ঘরের কবাট খুললে। তখনও কোনও ঘরে সন্ধ্যা দেখান হয় নাই, তবু অমিতা উদাসীন হয়ে খানিকটা উঠানে বসে রইলো। তার হাত-পা এগুচ্ছিল না আর, গৃহস্থালীর কোনও কাজ করতে।

সেই মুক্ত আকাশের তলে, তারকাদলের কুটীল হাসি উপেক্ষা করে সে অনেকক্ষণ বসে রইলো ধীর শান্ত ভাবে, আপনার জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে।

ঈশানবাবুর অন্তর্দ্ধান হওয়া অবধি এ বাড়ীতে আর কেউ দ্বিতীয় আত্মীয় থাকতো না, তাহার ছোট খোকাটি ছাড়া। একজন দাসী থাকতো দিবা-রাত্রি, সেই ছিল তার একমাত্র গৃহ-সঙ্গী! যে দেবরটি তাদের সঙ্গে গিয়েছিল শিমূলতলায়, সে ঈশানবাবুর শেষ বিদায়ের আগেই তার অসুবিধা বোধ ক'রে নিয়েছিল এবং সেই মাসেই আপনার পথ খুঁজে নেয়! সে ছিল আত্মীয়, কিন্তু বিপদের সময়ে নয়, সম্পদে!

এই বিরাট জনহীনতার মাঝে অমিতা নিত্যই বসে বসে ভাবতো তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ কোন্ দিক্ দিয়ে চালাবে। এতদিন ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারে নি, আজ ধীরেন এসে একটা পথে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে গেল। স্বামীর ঋণ যে তাকে শোধ করতেই হবে, এবং সেটা যতো আত্ম-সম্মানের মূল্য দিয়েই হোক্ না কেন, এই স্থিরসঙ্কল্প বেঁধে দিয়ে গেল ঐ ব্যক্তি যে তার আত্মাকে

খুব দরদীর মতই অপমান করে গেল। কিন্তু তবু তার মনে হ'ল, সে উপকার করে গেল, অপকার নয়।

দাসী এসে বললে: কই দিদিমণি? আজ কি উঠবে না?

যদি বলি, না?

বা রে! আমি কিছু খাবো টাবো না? আমায় ভাত বেড়ে দাও।

অমিতা বিরক্তির সহিত বললে: ঐ হেঁসেলে হাঁড়ি রয়েছে, তুই তা থেকে ভাত বেড়ে নিয়ে খেগে যা!

বারে! আমি তোমার হেঁসেল কেমন ক'রে ছোঁবো দিদিমণি?

অমিতা তখন কিছু উত্তর দিল না; মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইলো। একটু পরেই বললে: দেখ্, আমার আর এখানে ভাল লাগচে না! আমি আজই বাপের বাড়ী যাবো। যদি না ফিরি, তুই ঘটি বাটি যা আছে সব নিয়ে নিস্। আর ফিরিতো দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবো। তুই ঘর দোর গুলো পাহারা দিস্।

দাসী তো শুনে অবাক্। সে গালে হাত দিয়ে বললে: ওমা সেকি কথা! আর ফিরবে না? তা আমার মাইনে-গণ্ডা,—

ও! তোর মাইনে বাকি আছে, না? তা এক কাজ কর্। ঘটি বাটি তৈজসপত্র যা আছে, সব তুই নে। সেগুলো বিক্রি করে যা পাবি, তাইতেই তোর পাওনা চুকিয়ে নে। আমার কাছে আর পয়সা নেই। যদি কিছু বাকি থাকে, একদিন এসে দিয়ে যাবো।

তুমি তো বলচো, আর আসবে না?

তাই তো ভাবচি। কিন্তু তোর মাইনে যদি বাকি থাকে তাহ'লে আসতেই হবে। ঐ তৈজসপত্রগুলো বিক্রি করলে তোর সব মাইনে পুষিয়ে যাবে না?

তা কি যায়, দিদিমণি? আমার তিন মাসের মাইনে বাকি।

আচ্ছা, তবে পরশু এসে তোর মাইনে চুকিয়ে দেবো। তুই এ দুদিন বাড়ীটা পাহারা দিস।

অমিতা আর কোনও কথা না ক'য়ে, গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে নিল, ও ঘরগুলিতে চাবি কুলুপ লাগিয়ে খোকাকে কোলে নিয়ে বাড়ীর বাহির হয়ে পড়লো। তার দাসী হাঁ করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

(২৩)

সস্মিতবাবু হাইকোর্টের উকিল। কথা বেচে খান, কাজেই খাওয়ার চেয়ে কথাটাকেই বেশী ভালবাসেন। লোকে বলে কৃপণ, কিন্তু তিনি নিজে জানেন তিনি মিতব্যয়ী। সব কৃপণই আপনাকে মিতব্যয়ী ভাবে।

রাত তখন নয়টা। সস্মিতবাবু ঘর অন্ধকার ক'রে মনে মনে একটা সুদের অঙ্ক কষছিলেন, এমন সময়ে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁর অঙ্ক-কষবার সূত্র ছিঁড়ে দিল।

—দাদা? আমি এসেছি।

—কে? অমিতা?

—হাঁ। এই সন্ধ্যা বেলায় ঘর অন্ধকার ক'রে শুয়ে রয়েছো? অসুখ করেছে নাকি?

—না, অসুখ করে নি। আলো জ্বাললে ঘরের মধ্যে বড় পোকা মাকড় আসে। তাই পিদীপ নিবিয়ে আছি।

—তাই ভালো। আমার তো ভয় হয়েছিল!

—তার পর! আজ কি মনে করে?

অমিতা অন্ধকারে আপনার চোখটা মুছে বললে: আর কি মনে করে আসবো? আমার তো সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। তোমার বাড়ী ছাড়া আমি আর দাঁড়াই কোথায়?

—জামাইবাবু কিছু রেখে যায় নি?

—কিছু না। কি করে রাখবে? যা কিছু ছিল, সবই তো চিকিৎসায় খরচ হয়ে গেল।

—বলিস্ কিরে? অসুখের চিকিৎসায় সব টাকা খরচ করে ফেললি? আচ্ছা, ডাক্তারদের পেট ভরিয়ে কি হ'ল, বল্ দেখি?

—তা বলে রোগের চিকিৎসা করাবো না? তুমি কি বলচো দাদা?

—আরে রোগ হয় ভোগবার জন্যে। তা ব'লে টাকা খরচ কেন?

—টাকা মানুষের চেয়ে বড়?

সস্মিতবাবু উত্তরে বললেন: আরে শরীর খরচ করলেও যখন টাকা পাওয়া যায়না—তখন শরীরের চেয়ে টাকা বড় বৈ কি!

—কিন্তু শরীর গেলে যে জীবন থাকে না?

—আরে জীবন নাই বা রইলো! বিনা টাকায় জীবনের দরকার কি?

কথাটা শুনে অমিতা চমকে উঠলো। বিনা টাকায় জীবনের দরকার নেই? তাহলে তার তো আর টাকা নেই—তারও জীবনের দরকার নেই? তা যদি না থাকে, তাহ'লে স্বামীর ঋণটা জীবনের পরিবর্ত্তে শোধ করে দিই না কেন? ধীরেনবাবু যা প্রস্তাব করেছে, সেটা,—তার পর আর অমিতা ভাবতে পারলে না। কি সব গোলমাল হয়ে গেল!

সম্মিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : চুপ করে রইলি যে অমিতা ?

অমিতাকে কে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলে ; সে বললে : না—এই যে, তা—হাঁ—টাকাটা বড় দরকার দাদা !

দাদা জিজ্ঞাসা করলেন : সে কি রে ? এখন আর টাকা নিয়ে তুই কি কর্ব্বি ? এখন তো তোর একার শুধু দুটি খেতে ! আর বুঝি তোর একটা ছোট ছেলে আছে ? তার জন্যে আর কতো টাকার দরকার ?

—না দাদা ! শুধু আমার একার পেট নয় ! একটা বড়ো পেট আমাকে গিলতে চাইচে ! আমার স্বামী যাবার সময় ঋণ করে গেছেন। সেই ঋণটা আমায় শোধ করতে হবে।

সম্মিতবাবু শুয়ে ছিলেন, কথা শুনে একেবারে খাড়া হয়ে বসলেন। ...সে কিরে ? ঋণ করে গেছে ? এত টাকা মাইনে পেতো, তাতেও তার কুলোল না ! শেষকালে ঋণ ! তুই ঋণ করতে দিলি কেন ?

—সে অনেক কথা দাদা ! আমি ঋণ করতে বারণ করেছিলুম, কিন্তু তিনি যখন তাঁর জীবনটা ফিরে পাবার জন্যে ঋণ করতে চাইলেন, তখন আমি তাঁর স্ত্রী হয়ে কি বারণ করতে পারি ? টাকা আগে না তাঁর জীবনটা আগে ? ভিক্ষে করে হয় তো টাকা যোগাড় করতে পারবো. কিন্তু ভিক্ষে ক'রে তো তাঁর জীবন ফিরে পেতুম না !

সম্মিতবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : তুই বুঝি তোর স্বামীকে বড় ভালবাসতিস ?

—কে না ভালবাসে দাদা ?

সম্মিতবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : হুঁ। মেয়েমানুষদের ঐ একটা বড়ো জাতিগত দোষ আছে। তারা উচিতের চেয়ে বেশী ভালবেসে ফেলে স্বামীকে ! ভালবাসার সময় মনে রাখতে পারে না যে, তাতে টাকা খরচ বেশী হয়। একটু কম ক'রে ভালবাসলেই হয় ! ওটা তো

হাতের মুটোর মধ্যে !

দাদার কথা শুনে অমিতা তো অবাক্। দাদা এত লেখাপড়া শিখেছে, তবু এটা জানে না যে, স্বামীকে ভালবাসা মুদিখানা দোকানের জিনিষের মত নয়,—সেটা ওজন-দাঁড়িতে ফেলে মাপ করে কম বেশী করা যায় না। স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা নারীর জীবনের স্বাভাবিক গতি !

অমিতা চুপ করে আছে দেখে সম্মিতবাবু আবার আরম্ভ করলেন : তোর একটা বেজায় দোষ আছে দেখছি যে তুই বড়ো ভাবপ্রবণ। স্বামীকে ভালবাসবি তা এমন ভালবেসে ফেললি যে, তার অসুখ সারাতে গিয়ে একটা ঋণ করে বসলি ! কতো টাকা ঋণ আছে শুনি ?

এক হাজার টাকা !

উঃ। একহাজার? বলিস কিরে অমিতা? এতো টাকা তার চিকিৎসায় খরচ করেছিস? ডাক্তারের ওষুধখানা কি টাকা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলি, না কি? ধন্য উড়োনচড়ে মেয়ে যা হ'ক! এখন এই টাকা কি করে শুধবি ?

সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি, দাদা !

সম্মিতবাবু অন্ধকারের মধ্যেও তার দিকে চেয়ে বললেন :—তার মানে? আমি কি তোমায় এই হাজার টাকা দিয়ে দেবো, ভেবেছো? কি সর্ব্বনাশ! অমিতা? তুই কি ভাবিস, আমি তোর মত বাজে-খরচে? না বাপু, আইন ব্যবসা করে এইটুকু শিখেছি যে টাকা কখনও বাজে খরচ করতে নেই !

অমিতা দাদার উত্তর শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। সে অনেক আশা করে এসেছিল, তার সহোদর দাদার কাছে সে নিশ্চয়ই অর্থ সাহায্য পাবে। তার এই বিপদের সময়, একমাত্র ভগ্নিকে সামান্য

এক হাজার টাকা দিতে যে দাদা এত কথা তুলবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তবু আর একবার চেষ্টা দেখবার জন্যে সে বললে: আচ্ছা, টাকাটা একেবারে না দাও, আমায় না হয় ধার দাও।

সস্মিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন:—না, না, ধার টার আমি দিতে পার্কো না! আমার টাকার অনেক খরচ। আর ধার দেওয়া বড় কদর্য্য ব্যবসা। সুদ টুদ নিতে হয়, সে বড় লজ্জা করে।

—ধার তো আমায় কর্তেই হবে দাদা! অপরের কাছে আর কেন ধার করি—তার চেয়ে তুমি যদি দাও,—

অন্ধকারের মধ্যে মাথা নাড়তে নাড়তে সস্মিতবাবু বললেন: না, না, টাকা ধার আমি দিতে পার্কো না। সে বিষয়ে তুমি আমায় অনুরোধ করো না। টাকা বড় কঠিন জিনিষ, অমিতা! ওটা অতো সহজে দেওয়া যায়না!

অমিতা নিরাশায় একেবারেই মর্ম্মাহত হয়ে পড়লো। তার মনে হ'তে লাগলো, আ জসত্যই সে অনাথা! যে দিন থেকে তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, সে দিন থেকে সমস্ত পৃথিবীটাই তাকে পথে বসিয়ে রেখেছে! তাকে ঘরের মধ্যে তুলে নেবার বুঝি আর কেউ নেই!

হতাশায় মুমূর্ষু-কণ্ঠস্বরে অমিতা তবু একবার বললে: তুমি যদি না দাও দাদা, তাহ'লে কোনও বন্ধু-বান্ধবের কাছে টাকাটা ধার করিয়ে দাও।

যেন তরবারির আস্ফালন ক'রে সস্মিতবাবু চড়া-গলায় বলে উঠলেন: কে তোকে শুধু হাতে টাকা ধার দেবে? তুই কি কিছু বন্ধক টন্ধক দিতে পারবি?

কি বন্ধক দেবো, দাদা, আমার আর কি আছে?

তবে লোকে টাকা ধার দেবে কেন?

অমিতা আপন মনেই যেন বলে যেতে লাগলো, "যদি আমার স্বামীর পৈত্রিক বাড়ীখানাও থাকতো, তা'হলে সেটাও বন্ধক দিতে পারতুম। কিন্তু তাতো নেই। আমার শ্বশুর মশাই সেটা এক রকম দান করেই খুইয়েছেন "

হাঁ, সে তো জানি। তোর শ্বশুর বড় নির্ব্বোধ লোক ছিল। একটা জুয়াচোর ভাইপোকে বাঁচাতে আপনার পৈত্রিক ভিটেটা খোয়ালে। উড়োনচড়ে! যাক্ বাড়ী না থাকে, তোর গয়নাগুলো ত আছে?

না দাদা, তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আমার সব গেছে।

অ্যাঁ! বলিস কি? গয়নাগুলো শুদ্ধ বিক্রি করে রুগীর পেছনে খরচ করেছিস! নাঃ! তুই দেখছি, আমার বোন্ হ'তে পারিস না। তবে আর কি কর্ব্বি? এখন কষ্ট পা! তোমার মতো অ-হিসেবী মেয়েকে আমি টাকা ধার দিতে পার্ব্বো না! আর পাবোই বা কোথা থেকে! আমারই বা আছে কি?

অমিতা আর কোনও কথা কইলে না। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলো সেই অন্ধকার ঘরে। সম্মিতবাবু ঘরের আলোও জ্বাললেন না, আর কোনও কথা কইলেন না। গৃহে নীরবতার সঙ্গে নিরালোক রাত্রি ভ্রাতা-ভগিনীর মাঝখানে ক্রমশঃই দূরত্ব টেনে দিতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ককণ্ঠে অমিতা বললেঃ দাদা, তাহ'লে আমি আসি।

সম্মিতবাবু লজ্জার কোনও বালাই না তুলে, উত্তর করলেনঃ এসো!

(২৪)

অমিতা সেই রাত্রেই তাহার নিজের বাসাবাড়ীতে ফিরলো।

আসবার সময় মনের ধিক্কারে তার ভ্রাতৃ-জায়ার সহিতও দেখা করলে না।

অনেক রাত্রে শয্যায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো : অদ্ভুত! একসঙ্গে দু'জনে এক মায়ের কোলে মানুষ হয়েছিলুম! একবার বললে না, 'অমিতা আজকের রাত্রিটা থেকে যা, কাল সকালে যাস।' টাকা না দিক্, ভগিনীর ন্যায্য-পাওনা আদরটুকু দিতেও কি তার মনে বাধলো?

ভাই! এত বেশী রক্তের সম্বন্ধ আর কার সঙ্গে আছে? কিন্তু তবু এই রক্তই একদিন আপনার মধ্যে ঘোলাটে হয়ে ওঠে। কেন? মানুষের অবস্থা বিশেষে! রক্তই রক্তকে সম্পর্কের শাস্তি দেয়। আজ আমি দরিদ্র বিধবা না হয়ে যদি বড়লোকের সধবা আদরিণী হতুম,—তাহ'লে দাদা আদর করতো কিনা, কে জানে? এ কি আমার দারিদ্র্যের অভিশাপ না তার কৃপণের স্নেহশূন্যতা? অমিতা অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারলে না, এটা কি?

অভিমানে তার মন ভরে গেল; আর সেই পাষাণের মত কঠিন অভিমানের ওপর সে সমস্ত রাত্রি আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগলো নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নকে সঙ্গী ক'রে।

সকাল হলো, কিন্তু তার মনের অন্ধকার কিছুতেই দূর হলো না। শয্যা ছেড়ে সে যে গৃহস্থালী কাজে উঠে লাগবে, এটুকু উৎসাহ সে কিছুতেই হাতড়ে পেলে না। দাসী এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলো, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিলে না।

কিন্তু মানুষের জীবন এমনি ভাবে তৈরী, যে অসহ্য অশান্তির মাঝে থেকেও তাকে সাধারণ নরনারীর মতো সংসারের কাজে জোর ক'রে হাত লাগাতে হয়। মানুষের জীবন যে ভীষ্মের শরশয্যা। এর

দশ দিকে যে দশটা বাণ শরীরকে বিঁধে তুলে ধরে রাখে। পাশ 'ফিরে একটা বাণের আঘাত' এড়ালেও আর নয়টা বাণের দংশন যাবে কোথায় ?

সকাল একটু গড়িয়ে যেতেই অমিতা উঠলো দৈনন্দিন জীবন ধারণের ব্যবস্থা কর্বার জন্যে। সে রসুই-ঘরে প্রবেশ ক'রে যেমনি পাকের আয়োজন করতে যাবে, এমন সময়ে বাড়ীর মালিকানী এক বৃদ্ধা এসে বললেন : কই গো ভাড়াটে বউ, আজ ভাড়ার টাকাগুলো দেবে নাকি ?

সে সময় যদি কেউ অমিতাকে এক বেত দিয়ে প্রহার করতো, তাতেও তার তত্তো যন্ত্রণা ঠেলে উঠতো না, যে-যন্ত্রনাটা সে সহসা অনুভব করলে এই বাড়ীওয়ালীর অসাময়িক দাবিতে। একে তার হাত একেবারেই শূন্য, তাহার উপর গত কল্য রাত্রে তার ভাইয়ের কাছে কি নিদারুণ নিষ্ফলতাটা সে পেয়ে এসেছে। এমন সময়ে সে কি ক'রে বাড়ীর বাকি ভাড়াগুলো দিয়ে দেয় ? সে নিরুত্তর হয়ে ভাবতে লাগলো কি জবাব দেবে ?

কিন্তু য পাওনাদার সে নিরুত্তর চায় না,—কথার উত্তরও চায় না,—চায় টাকার উত্তর। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন : 'কি গো বাছা, কথার জবাব দিচ্চ না যে ?' অমিতার মনে হ'ল এক যমদূত এসেচে তার কাছে কৈফিয়ত নিতে। সে ঢোঁক গিলে বল্লে :

আচ্ছা বাড়ীওয়ালী মাসি ? ভাড়া চাইবার এই কি সময় ? মানুষ কি নাওয়া খাওয়া কর্ব্বে না ?

বাড়ীওয়ালী বললেন : নাওয়া খাওয়া কর্ব্বে বলে আমি ভাড়া চাবো না ? এ কোন্-দেশী কথা ?

অমিতা বললে : আচ্ছা মাসি, তোমার মাথায় কি বিবেচনা ব'লে

একটা জিনিষ নেই ?

—না বাপু, আমাদের মাথায় বিবেচনা নেই, বিবেচনা যতো ভাড়াটেদের ! এই যে, তিন মাসের ভাড়া দাও নি, এটা কোন্ বিবেচনার কথা শুনি।

—দেখো মাসি, আজ পাঁচ ছয় বচ্ছর আমরা তোমার এখানে আছি যত দিন তিনি ছিলেন, তত দিন মাস পড়তে না পড়তে তোমার ভাড়া দিয়েছেন। মাইনে সিন্দুকে তোলবার আগে তোমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে দিয়েছেন। আজ তিন মাস তিনি গেছেন, আমাকে পথে বসিয়ে। এতে তোমার মনে একটুকু দয়া হয় না যে, টাকাটা আমি যোগাড় করে এনে তোমায় দি।

—না বাপু, আমি দয়া করতে পার্ব্বো না। তুমি এখনই যদি টাকা দিতে পারো ভালই,—নইলে আজ বিকেলেই তুমি বাড়ী খালি করে দাও।

বাড়ীওয়ালীর কথা শুনে অমিতার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। একটা ভুলে-যাওয়া ক্ষতের জ্বালা হঠাৎ কে যেন খুঁচিয়ে, তার মর্ম্মের কোণে কোণে নিদারুণ যন্ত্রণা এনে দিলে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বসে পড়লো একটা অপ্রত্যাশিত অপমানের আঘাতে !

কিছুক্ষণ পরে, অমিতা অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বাড়ীওয়ালীকে বললে : আচ্ছা তাই হবে। বাড়ীই আমি শীগগির খালি করে দেবো।

এ কথা শুনে বাড়ীওয়ালী তার গালির ঝুড়ি নামিয়ে দিলে অমিতার মুখের ওপর। কিন্তু অমিতা তার সহস্র অপমানসূচক গালি শুনেও, একটি কথা আর কইলে না। বাড়ীওয়ালী উত্তরের অভাবে সেই শুভকাজ থেকে তখনকার মত নিরস্ত হলো।

বৈঠকখানা-সংলগ্ন বারাণ্ডায় একখানা আরাম-কেদারা টেনে এনে,

ধীরেন তাইতে বসে সন্ধ্যার হাওয়া খাচ্ছিল। সম্মুখেই ছিল একটা স্বহস্ত-রচিত ফুলগাছের বাগান, যেখানে তার যৌবনের অনেক অতৃপ্ত নেশা তৃপ্তির সন্ধানে মাথা কুটা-কুটি করেছিল। •

(২৫)

ফাল্গুনের বাতাস-পাগল সন্ধ্যা অন্ধকারকে টেনে আনছিল ফুল গাছগুলির চারিদিকে। ধীরেনের মনে সুখ ছিল না, সে কেবলই চাইছিল ঐ তিমিরাচ্ছন্ন গাছগুলির দিকে। তার মনে হচ্ছিল, ঐ রকম একটা দুঃসাহসী অন্ধকার তার বুকের ফুলগাছগুলিকেও বিষণ্ণতায় ঢেকে রেখে দিয়েছে। আকাশ হতে জ্যোৎস্না নামলে ফুলগাছের অন্ধকার হয়তো কেটে যাবে, কিন্তু তার নিজের মনের অন্ধকার কোন্ জ্যোৎস্না এসে যে দূর করে দেবে, তার সন্ধান সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না।

মাঝে অমিতাকে ভোলবার সে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু কই তাকেতো ভোলা গেল না। তার শুভাধ্যায়ী বন্ধুরা ভোলাবার বড় উপাদানের ব্যবস্থা করেছিল তার বৈঠকখানায় বসে; বোতল থেকে সুরার ধারা ঘরের মেঝেয় ঢেউ খেলে গিয়েছিল, কিন্তু তবু সেই ভোলবার রাজ্যের মধ্যে বসেও, কোথা থেকে অমিতার স্মৃতি এসে আলেয়ার মতো দপ দপ করে জলে উঠতো, তা ধীরেন বুঝতে পারতো না। সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে থেকে সেই অপমানকারিণীর অপমান ভুলবে বলে ঠিক করেছিল ধীরেন; বন্ধুরা বড় বড় ওস্তাদ এনে কতোদিন গান শোনালে; সহরের নামজাদা বাইজী কতোগুলি এসে তাদের বিশ্ববিমোহন কণ্ঠে সুললিত গান গেয়ে গেল; কিন্তু ধীরেনের

মনে হ'ত, সেই গানের মোহের মধ্য থেকে একটি নিভৃত গৃহস্থ-বাড়ীর ঝঙ্কারহীন ক্ষীণকণ্ঠ তার কাণের কাছে এগিয়ে আসছে সমস্ত উদ্দাম সুর বাজনা তান লয় মূর্চ্ছনা ঠেলে। বন্ধুরা কতোদিন তাকে নগরের প্রসিদ্ধা রূপজীবিনীর বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কই সেখানেও তো ধীরেনের মন বাঁধা পড়লো না।

আজ সকাল থেকেই তার মনে হচ্ছিল, সে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েচে। দ্রবময়ী-নেশা, সবান্ধব খেলা-ধুলা, সুর-তালযুক্ত সঙ্গীত, পুরুষ-বিমোহিনী রূপ-ব্যবসায়িনীর বিলোল কটাক্ষ, সব যেন তার কাছে হয়ে গেল ফাঁকা। তার মনে হতে লাগলো, পৃথিবীর ভাণ্ডারে এমন কোনও সৌন্দর্য্য নেই, যাতে তার মন নিরাশার পাঁক থেকে ঠেলে উঠতে পারে। এতো বিত্তহীন হয়ে গেল তার বিত্তশালিতা, যে, সে আপনাকে রাস্তার ভিখারীর চেয়ে নিঃসহায় ভাবতে লাগলো।

বেয়ারা খবর দিল, তার বন্ধুরা এসে দেখা করতে চাইচে। ধীরেন অতি নিষ্করুণভাবে বললে: 'তাদের বল, আজ আমার শরীর ভাল নেই, আজ আর দেখা হবে না।' শরীর খারাপ শুনে বন্ধুরা আরও জিদ্ ধরলে দেখা করবার জন্যে; কিন্তু ধীরেন তাতে বিরক্ত হয়ে বললে: 'বল্, বেশী গোলমাল করো না, করলে অপ্রিয় কথা শুনতে হবে।' প্রিয় বন্ধুদের ওপর এ উত্তরটা খুবই তিক্ত বটে, কিন্তু ধীরেন তাতেও পরাঙ্মুখ হ'ল না।

সন্ধ্যা হ'তে বসে বসে রাত্রি আটটা বাজলো, পথে লোকজন চলা ক্রমশঃ কম হতে লাগলো, বাড়ীর ভিতর হ'তে তার বৃদ্ধা পিতৃস্বসা কতবার ডেকে পাঠালেন, কিন্তু তবু ধীরেন সেখান থেকে উঠলো না। আলস্য তার শরীরকে একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

ঘড়িতে ঠং ঠং করে ন'টা বাজলো, এমন সময়ে একখানা ঠিকাগাড়ী

তার বাড়ীর দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়া'ল। ধীরেন বিস্মিত হ'ল এই ঠিকা গাড়ী থামতে। তার বাড়ীতে এত রাত্রে কোনও আত্মীয় আসে, এমন সম্ভাবনা তো মোটেই নাই। বন্ধু বান্ধব? তারা তো এইমাত্র অশ্রদ্ধার চাবুক খেয়ে গেল।

বেয়ারা এসে বললে: 'বাবু? একটি ভদ্দর লোকের ঘরের মেয়ে এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' ধীরেন বিরক্ত ভাবে বললে: 'তাঁকে নিয়ে পিসিমার কাছে নিয়ে যা।' ভৃত্য বললে: তাঁকে বলেছিলুম, কিন্তু তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে তাঁর কথা, পিসিমার সঙ্গে নয়।' ধীরেন আরও বিস্মিত হ'ল ভদ্রনারীর এই ব্যাপিকাভাবে। মনের মধ্য হ'তে রাগও খানিকটা ঠেলে উঠতে লাগলো। কিন্তু যখন সেই নারীটি সহসা বিনানুমতিতে ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে আপনা-হতেই বললেন 'আমি এসেচি ধীরেনবাবু! একটু দরকার আছে।' তখন তাঁর কণ্ঠস্বর ধীরেনের বিরক্তি, রোষ, বিস্ময় একেবারেই এক নিমেষে উড়িয়ে দিয়ে গেল একটা প্রবল, অপ্রত্যাশিত ঝড়ের মত

—কে, অমিতা?

— হাঁ!...আমার একটা কথা ছিল!

—এসো, ঘরের মধ্যে এসো, ঐ চেয়ারখানাতে বসো। ধীরেন দাঁড়িয়ে উঠে অমিতার দিকে ফিরে এই কথাগুলো বললে।

কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ধীরেন চম্‌কে উঠলো। এ কয়দিনে অমিতার কতো না পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে! কি শীর্ণই না হয়ে গেছে তার মুখখানি! চোখ দু'টো একেবারে কোটরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। কপোল,—যা ছিল অরুণোদয়ের আকাশের মত, এখন হয়ে গিয়েছে সূর্য্যাস্তের প্রান্তর! কিন্তু শীর্ণ হোক্, কান্তিটুকু যেন কে কাপড়ে ঢেকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছে। তার রক্তিমতা যতো কমে গিয়েছে,

দীপ্তি ঠিক ততটাই প্রতিশোধ-সহকারে বেড়ে উঠেছে। এ আর এক রূপ! এতে লালসা নাই, কিন্তু মোহ আছে! ঘৃণা নাই, কিন্তু দৃঢ়তা আছে!

এই অমিতা! একদিন তাকে খুব কঠোরভাবেই জবাব দিয়েছিল! ব্যবহারও করেছিল অসহনীয়!···শিমূলতলার সমস্ত ঘটনার কথা মনে আসতে ধীরেনবাবু শিউরে উঠলো!···আজ আবার না জানি, নতুন কি কঠোরতা কর্বার জন্যে এসে উপস্থিত। ধীরেন অমিতাকে ইদানীং ভয় করতো।

ধীরেন বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললে: তুই একটু বাইরে যা, ইনি কি বলেন, শুনে নি।

বেয়ারা চলে গেল।

ধীরেন অমিতার দিকে তাকিয়ে বললে: কি বলবে বলো অমিতা!

অমিতা নতমুখী। কি বলবে সে, ধরণীর বুকের মাঝখানে খুঁজছিল। এই ঘরে ঢুকে, ধীরেনকে দেখেই সে বলবার কথাটা হারিয়ে ফেলেছে। সে ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

ধীরেন বললে: তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, অমিতা? কি বলবে বলো!

অমিতা ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখে বাম হাতের নখ দিয়ে খুঁটতে লাগলো। মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হলো না।

ধীরেন বড়ো বিস্মিত হয়ে উঠলো। অমিতার এমন সময়ে এখানে অযাচিত ভাবে আসাটাই একটা পরম কুহেলিকা, তার ওপর আবার এই কথা বলতে যাওয়ার ইতস্ততঃ-ভাব! ধীরেন কিছুই বুঝে ঠিক ক'রে উঠতে পারলে না।

অমিতা তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে! নিস্পন্দ, নীরব অথচ আকুল।

তার ওষ্ঠ কাঁপতে লাগলো, অথচ কথা বার হ'ল না।

অনেকক্ষণ পরে, অনেক চেষ্টা ক'রে সে বললে: ধীরেনবাবু! আপনি সেদিন আমায় যে প্রস্তাবটা করে এসেছিলেন,—

বলতে বলতে অমিতা থেমে গিয়ে চক্ষু নত করলে। ধীরেন আরামকেদারায় পুনরায় স্থান-পরিগ্রহ করে বললে: তার উত্তর তো সে দিনই আমায় দিয়ে দিয়েছো অমিতা!

—আপনি বোধ হয়, সে দিন আমার ওপর খুব রাগ করেছেন?

—আবার সে কথা কেন অমিতা? আমি জানি তুমি যা একবার বলেছো, তা আর ফেরাবে না, তবে আর সে কথা কেন?

—কিন্তু,—

—কিন্তু, কি অমিতা?

অমিতা দু'তিনবার ঢোক গিলে অতি মৃদুস্বরে বললে: কিন্তু আজ আমি মত বদলেছি।

ধীরেন কেদারা থেকে একবারে লাফিয়ে উঠে বললে: বদলেছো? বদলেছো, অমিতা? সত্যি?

অমিতা চক্ষু নত করে বললে: ওঃ ধীরেনবাবু! মানুষের চিরদিন সমান যায় না!··আমার গোমর ভেঙে গেছে!···আমি আজ ঝড়ে উপড়ে-পড়া বটগাছ!

ধীরেন আর কিছু শুনতে চায় না; সে একেবারে আনন্দে উতল হয়ে, হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে বললে: তবে এসো, এসো অমিতা, আমার এই বাহুবন্ধনে—

অমিতা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বললে: না, এক্ষুনি নয়! আমার একটা কড়ার আছে, সেটা স্বীকার কর্বেন বলুন।

—নিশ্চয়ই কর্বো। তুমি যা বলবে, তাই করবো। কিছু অন্যথা হবে না। কি কড়ার বলো।

অমিতা মৃদুস্বরে বললে: আমাকে আগে বারশো টাকা দিতে হবে।

—বারশো কেন? তোমায় বার হাজার টাকা দিতে পারি।

অমিতা মুখ তুলে বললে: অত চাইনে। চাই বারশো।…একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললে: কই দিন।

—আজই?

—হাঁ, এখনই।

—আমি স্বীকার কচ্ছি অমিতা, কালই তোমাকে দেবো। আজ আমার বাড়ীতে টাকা নেই—কাল ব্যাঙ্ক্ থেকে টাকা এনে দেবো।

অমিতা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে: তবে আজ থাক্। কালই আমি আসবো।

ধীরেন মর্ম্মাহত হয়ে বললে: তুমি আমায় বিশ্বাস করো না, অমিতা?

অমিতা আবার সম্মুখ দিকে ফিরলো। তার মুখে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রস্তরের মত খোদা। সে বললে: আপনাকে বিশ্বাস করি না? একথা বললে আমার যে জিব খসে যাবে! আপনি আমাদের একদিন যে উপকার করেছেন, তা আমি মরে গেলেও ভুলবো না।

ধীরেন আশা পেয়ে বলে উঠলো: তবে এসো, আজ আমার জীবন-ভোর তপস্যার শেষ করো।

অমিতা আবার বেঁকে দাঁড়ালো। সে বললে: না, তা হবে না। আমি যতক্ষণ না আমায় স্বামীর ঋণ শোধ কচ্ছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শরীরকে অকলঙ্কিতই রেখে দেবো। আমি নিজ হাতে

আপনাকে আমার স্বামীর ঋণের টাকা দেবো, তারপর,—আপনাকে আমার শরীরটা বিলিয়ে দেবো।

—ওঃ! সেই জন্যে তুমি আমার কাছে টাকা চাইচো? কি পাগলামি! অমিতা? আমি এখনই সেই হ্যাণ্ডনোটখানা নিয়ে এসে তোমার সুমুখেই ছিঁড়ে ফেলচি। কেমন তাহ'লে হবে তো?

অমিতা দৃঢ়স্বরে বললে: না, তা হবে না। আমি টাকা শোধ করলে তবে আপনি হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়বেন, তার আগে নয়।...যাক্, চললুম আজ আমি। নমস্কার।

সহসা, অতি রূঢ় উচ্ছ্বাসে, অমিতা ঘর হতে বাহির হয়ে গেল। ধীরেন বুঝে উঠতে পারলে না, তার ভাব-প্রবণতার অর্থ কি! সে অনেকবার পশ্চাৎ থেকে ডাকলে, কিন্তু অমিতা কোনও উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

(২৬)

আকাশের নীলাভা গাঢ় হয়ে এসেছে, কিন্তু নক্ষত্র এখনও ফুটে নাই। সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চল নির্লজ্জ ক্ষিপ্রতায় পৃথিবীকে নূতন সজ্জায় সজ্জিত করে দিচ্ছিল। আকাশের গায় হা হা শব্দ তুলে পাখীরা বাসায় ফিরছিল।

এমন সময়ে অমিতা ফিরলো, একখানা রিক্স গাড়ী ক'রে, তার বাসাবাড়ীতে। সমস্ত মধ্যাহ্নটাই আজ সে ঘুরেছে পথে পথে, বিপণিতে বিপণিতে, একটা অন্তর্ভেদী উদ্দাম উচ্ছ্বাসের তাড়নায়। কি একটা সঙ্কল্প সে মনে স্থির করে নিয়েছিল, কিন্তু সেটাকে রূপ দিতে সে যেন কিছুতেই পেরে উঠছিল না।

বাসায় ফিরে সে আর একবার ভাল করে স্নান করে ফেললে। তারপর একখানি পরিচ্ছন্ন থান কাপড় পরে, চুলগুলি অসম্বদ্ধ অবস্থায় রেখে দিয়ে সে তার পেট্‌রাটি খুলে একখানি ফটোগ্রাফ বার করলে। ফটোগ্রাফখানি তার স্বামীর।

ফটোগ্রাফখানির দিকে তাকিয়ে সে আর আপনাকে স্থির রাখতে পারলে না। চক্ষু দুটির সমস্ত সীমানা ভরে উঠলো অবাধ অশ্রুর প্রবল বন্যায়! হঠাৎ তার বুকের দরজা খুলে কতকগুলি উচ্ছ্বাস বাহিরে মুক্তিলাভ করলো পূর্ব্ব-স্মৃতির পুণ্যতম সৌরভ নিয়ে। অমিতা ফটোগ্রাফখানি সম্মুখে রেখে বললে: "স্বামি! দেবতা! আজ বলে দাও, আমি ঠিক করছি, কি তোমার অপ্রিয় কাজে তোমার তর্পণ করতে বসেছি। তুমি বলেছিলে, যে-কোনও উপায়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করতে। আমি তো আর কোনও উপায়ই দেখতে পেলাম না, এক-এই উপায় ছাড়া। তোমার অনুমতি দাও, প্রভু! আর তো সময় নেই!"

গলায় আঁচল দিয়ে, মাথা নুইয়ে অমিতা অনেকবার প্রণাম করলে ঐ চিত্রার্পিত স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির পায়ে! চক্ষু দিয়ে আবার দরবিগলিত ধারা বইতে লাগলো। অনেকবার করতল একত্রিত ক'রে, কুসুম-কোরকোপম চক্ষু দুঃটি নিমীলিত ক'রে, মনে মনে তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলে। তারপর উঠে, স্থির হয়ে স্বামীর চিত্রখানি আপনার বাক্সের মধ্যে সযত্নে তুলে রেখে দিল!

তারপর চক্ষু মুছে, আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়ে ঘরের দেরাজ খুলে অমিতা একটি আরকের শিশি বার করলে। দুপুরবেলা বাড়ী থেকে বার হয়ে একা সহরের দোকানপটীতে ঘুরে ঘুরে সে যে সওদা করে এনেছিল, তাই থেকে এই আরকটি তৈরি করেছিল, খানিকটা জল

মিশিয়ে। অপরাহ্নে প্রায় অর্দ্ধেকটা খেয়ে রেখেছিল, এখন বাকিটুকু খাবার জন্য সে শিশিটি বার করলে।

আরকটি খাবার পর থেকে মাথাটা তার খুবই ঘুর'ছল! কিন্তু জোর-করে-টেনে-আনা মানসিক শক্তিতে সে মাথাঘোরা একেবারেই অগ্রাহ্য করতে লাগলো। যে-আরক পান ক'রে তার এতো শারীরিক কষ্ট হচ্ছিল, সেই আরকই আবার কাঁচের গেলাসে ঢেলে পান করতে লাগলো।

আরকের তিক্ততায় মুখের মাংসপেশীগুলি কি নিদারুণ অসম্মতিই জানাতে লাগলো। বন্দীকে জোর করে ধরে বেত প্রহার করলে, সে যেমন নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় এঁকে বেঁকে ছটফট করতে থাকে, মুখের প্রত্যেক সুষমাময় মাংসপেশী ঠিক তেমনই রুদ্ধ আবেগে আকুঞ্চিত বিক্ষুব্ধ হতে লাগলো। সাপকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে, সেটা যেমন এঁকে বেঁকে কুণ্ডলিত হয়ে যায়, তেমনি হয়ে যেতে লাগলো তার সুন্দর মুখের চম্পক-রক্তিম গণ্ডদেশ দুটি! কিন্তু তবু অমিতা আরক খাওয়া বন্ধ করলো না, পাষাণ-কঠিন সঙ্কল্পে।

শিশিটি যখন একেবারে শেষ হয়ে গেল, তখন অমিতা আপন মনে বলে উঠলো: এতে কি হবে? যদি না হয়? হবে বৈকি! এই তো মাথা ঘুরছে, এই তো পা টলমল কচ্ছে! এ ওষুধতো তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে যাব বলে! এ তো বিষ নয়,—এ যে অমৃত! এ তো আমার শেষ নয়, এ তো আরম্ভ! নইলে,—

ঝি ভেজান দরজা ঠেলে, ঘরে ঢুকে বললে, দিদিমণি! সেই বাবুটি এসেছেন!

অমিতা স্বপ্নাবিষ্টের মতো শুনলে সে কথা! শুনে বললে: তাঁকে বসতে বল্ ও ঘরে, আমি যাচ্ছি!

ঝি চলে গেল।

তখন অমিতা আবার একবার হাত-দুখানি মাথায় ঠেকিয়ে, পরলোক-গত স্বামীকে উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে, পরিহিত কাপড়খানি হাত দিয়ে সংযত ক'রে অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য গেল।

(২৭)

ধীরেন পাশের ঘরে অপেক্ষা কচ্ছিল অমিতার জন্য!

অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে টলতে টলতে অমিতা ঘরের মধ্যে এসেই চৌকির উপর বসে পড়লো।

ধীরেন অমিতাকে দেখেই বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে,—পকেট থেকে একটা টাকার থলি বার ক'রে,—অমিতার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলে উঠলো: এই নাও অমিতা, তোমার টাকা! এতক্ষণে বিশ্বাস হ'ল তো?

অমিতা জড়িত স্বরে বললে: বিশ্বাস কবে হইনি ধীরেনবাবু? বরাবরই তো হয়েছে! কেবল শরীরটাকে বিশ্বাস ক'রে দিতে পারি নি, এই তো?

ধীরেন বললে: এখন, সে বিশ্বাসটুকুও পাবো তো?

মাতালের মতো জড়ানো স্বরে অমিতা বললে: পাবে! কিন্তু দাঁড়াও এখনও দেরি আছে! টাকা?

—এই যে টাকা! এই থলিতে বারোশো টাকা গুণে এনেছি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতেই তো দেরি হলো! তাই কি সহজে হয়? কতো মিথ্যা কথা ব'লে, তবে পিসিমার কাছ থেকে চেকের বই বার করেছি!

অমিতা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে: মিথ্যা কথা? ভাল করো নি! সত্যি বললেই পারতে!

—এ সত্যিটা কি পিসিমা'র কাছে বলা যায়?

অমিতা বললে: না, বলা যায় না। স্বামীর কাছেও বলা যায় না! কিন্তু আমি বলেছি!

ধীরেন বসেছিল একখানা কেদারায়। উঠে এসে অমিতার কাছে বসলো; বসে বললে: কি আবোল তাবোল বকচো অমিতা?

অমিতা সংক্ষেপে উত্তর করলে: কিছু না! তার পর উঠে টাকার থলিটি তুলে নিয়ে বললে: ধীরেনবাবু? আমার স্বামী—আপনার কাছে যে এক হাজার টাকা ধার করেছিলেন, আমি সেইটে আজ শোধ দিচ্ছি! এই নিন টাকা। হাজার টাকা আসল, আর দুশো টাকা সুদ! কেমন, এতে হবে তো?

এই কথা কয়টা বলতে অমিতার কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপলো না, একটুও জড়িত হ'ল না। হঠাৎ সে যেন খুবই প্রকৃতিস্থ!

ধীরেন কিন্তু আপত্তি তুলে বললে: না অমিতা! সে ধারের টাকা আমি চাই না। সে ধার অনেক দিন শোধ হয়ে গেছে!

অমিতা দৃঢ়স্বরে বললে: শোধ হয়ে গেছে? না, হয়নি। কোনো দিনই না। আজ শোধ দিচ্ছি। তুমি টাকাটা হাতে তুলে নাও।...হাঁ, আর এক কথা! সে হ্যাণ্ডনোটখানা কই?

ধীরেন একটু হেঁসে বললে: সেখানা আমি অনেকদিন পুড়িয়ে ফেলেচি।

পুড়িয়ে ফেলেছো? কেন?

কি হবে অমিতা, সেটা রেখে?

কি হবে, মানে? আমি যদি টাকা না দেই, তুমি নালিশ করতে কি দেখিয়ে?

নালিশ? তোমার নামে? না অমিতা, আমার মন অতো ছোট নয়।

কিন্তু আমাদের মনতো তাব'লে ছোট হতে দিতে পারি না। টাকা আমার স্বামী ধার করেছিলেন, এ কথাও সত্যি; আর শোধ দিতে পারেন নি, একথাও সত্যি! কিন্তু আমাকে তাঁর প্রতিনিধি রেখে গেছেন তাঁর ঋণ শোধ করতে! আজ সে-ঋণ শোধ কচ্ছি! আমার কিছু ছিল না, তাই এই শরীরটাকে বেচে তোমার ঋণ শোধের টাকা জোগাড় করলুম। আমার ঋণের ছাড়পত্র দাও, ধীরেনবাবু!

তোমার ঋণ অনেক দিন শোধ হয়ে গেছে! একথা তো তোমায় বারবার বলছি! তুমি ও-টাকাগুলো তুলে রাখো!

অমিতা ধীরেনের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো! তার পর বললে: টাকা তুলে রাখবো? তুমি কি ভাবো, আমি তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, আমার নিজের ভোগের জন্যে? একটুও না! এ আমার স্বামীর ঋণ শোধের টাকা! এ টাকা তোমার! তুমি দিলে, আবার তুমিই তুলে নাও, ধীরেনবাবু! পরিবর্ত্তে আমার এই অসার শরীরটাকে তোমায়—বিক্রি করলুম।

ধীরেন হাত দুখানি প্রসারিত ক'রে বললে: যাক্ সব চুকে গেল!...তাহ'লে এখন এসো অমিতা! আমার বাহুবন্ধনে এসো!

অমিতা চক্ষু বুজিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে এলো। ধীরেন তাকে বাহুর শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললে। অমিতা শুধু একবার ভ্রূ তুলে বললে: আঃ! আজ আমার বড় আনন্দের দিন! আজ আমার স্বামীর ঋণ শোধ হয়ে গেল! অসতী? আমি অসতী? কে বলে আমি অসতী? যে নারীত্ব অটুট রাখতে পারে, সে কখনও অসতী হয়? নারীত্ব আগে, না সতীত্ব আগে? আমি যদি আমার স্বামীর কথা না রাখতুম—!যদি স্বামীর ঋণ শোধ না দিতাম,—তাহ'লে আমার চেয়ে বড়ো অসতী আর কে থাকতো?

বহু দিনের আশার ফল হাতের মধ্যে পেয়ে, ধীরেন প্রীতির সমস্ত অর্ঘ অমিতার মুখে, গণ্ডে ঢেলে দিতে লাগলো। অমিতা আপন মনে কত কি বকে যেতে লাগলো, কিন্তু ধীরেন বাবু সে সবে একটুকুও কাণ দিলে না। তার ছিল তখন চাতকের পিপাসা।

যৌবনের সমস্ত চাহিদা পূর্ণভাবে তৃপ্ত করলো ধীরেনবাবু, অমিতার উৎসর্গীকৃত শরীরের উপর দিয়ে। দু'জনে তারপর আলিঙ্গন-বদ্ধ হ'য়ে শুয়ে রইলো।

গভীর রাত্রে ধীরেন অনুভব করলে, অমিতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক রকমের শীতল। শুধু তাই নয়, অমিতা যে অনেকক্ষণ ধরে কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না,—এতেও তার মন বড় সন্দিহান হয়ে উঠলো। সে শয্যা থেকে উঠে আলো জ্বাললে। জ্বেলে যা দেখলে, তাতে তার মিলনের উল্লাস অঙ্কুর-পথেই শুষ্ক হয়ে গেল।

এ কি! অমিতার অমন সুন্দর উষার মতো উজ্জ্বল মুখখানি যে একেবারে নীলবর্ণ হয়ে গেছে! কিশলয়-সদৃশ ওষ্ঠাধরের মাঝখান দিয়ে সবুজ ফেণার ধারা অবিরল স্রোতে বাহির হচ্ছে। চক্ষু দুটি নিমীলিত!

এ কি! অমিতার কি কোন অসুখ?

ধীরেন অমিতাকে ডাকলে।

প্রথম দু'এক ডাকে সে উত্তর দিলে না; তিন চার বার ডাকার পর সে চক্ষু মেললো। কিন্তু চক্ষে যেন তখনও স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে। কুজ্ঝটিকাবৃত সন্ধ্যায় নবোদিত চন্দ্রের প্রতিমাখানি যেমন দেখতে হয়, আঁখিদুটি তেমনি অস্পষ্ট, তেমনি নিষ্প্রভ!

একটু আশ্বস্ত হয়ে ধীরেন জিজ্ঞাসা করলে: তোমার কি কোনও অসুখ করেছে, অমিতা?

অমিতা উত্তরে ঠোঁটদুটি নাড়তে লাগলো; কোনও ভাষা সুস্পষ্ট ভাবে মুখ থেকে বেরুলো না! নিদ্রার আবিলতা যেন সাস্ত্রী হয়ে কণ্ঠস্বরকে বাহিরে আসতে দিল না।

ধীরেন বললে: কি বলছো তুমি, বুঝতে পাচ্ছিনে। তোমার কি কোনও অসুখ করেছে?

অমিতার উত্তর এবার একটু স্পষ্ট হ'ল। সে বললে: অসুখ? না। অসুখ করেনি। আমি চললুম।

—কোথায় চললে, অমিতা?

—আমার স্বামীর কাছে। তিনি যে আমায় ডাকচেন। আমার কাজতো ফুরিয়েছে!

ধীরেন নিতান্ত শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: সে কি? কি বলচো তুমি?

—হাঁ, আমি চললুম। আমার শরীর কলঙ্কিত হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের জীবনে শরীরের দায়িত্ব কতটুকু? এই বাহিরের আবরণের মধ্যে, ভিতরে যে মানুষটি আছে সে কোনও পাপ করেনি; তাই তার ডাক পড়েছে তার স্বামীর চরণের কাছে। তুমি কিছু মনে করো না, ধীরেনবাবু! টাকাগুলো তুলে রেখো! উটি আমার স্বামীর ঋণ শোধ! আর আমার খোকাটিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম! সে নির্দোষ! তাকে—বাঁচিয়ে রেখো। অনাথ, পিতৃ-মাতৃহীন বালক ব'লে!···তোমার তো ছেলে-পুলে কিছু নেই! একটা পথে-কুড়ানো ছেলেকে না-হয় মানুষ করলে?

অমিতার কথা কহিবার ভঙ্গি দেখে ধীরেন বড়ই ভয় পে'ল। আর

তার শেষ কথাগুলো এতই জড়িয়ে যাচ্ছিল যে, সেটা যে একট সাংঘাতিক বিপদের লক্ষণ, তা বুঝতে ধীরেনের বাকি রইলো না। সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলো: কোনও বিষ খেয়েছো, অমিতা?

অমিতার নীল অধরের কোণে ফিক্ করে একটু হাঁসি দেখ দিল। সে সেই হাঁসিটুকু অটুট রেখেই বললে: আফিং খেয়েছি!

ধীরেনের বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো, আফিংএর নামে। তা মাথা ঘুরতে লাগলো; শরীরের সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে জ হয়ে গেল।

সে খানিকক্ষণ কোনও কথা কইতে পারলে না। শেষে অনে কষ্টে অমিতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে: কেন এই কাজ কর অমিতা? আমায় বললেই হোতো, আমি তোমার কথামত চলতুম।

কিন্তু অমিতা আর কোনও উত্তর দিল না। যে সেই চ বুজুলে, আর চাইলো না। দূরে পেচকের বিকৃত স্বর রজনীর নীরবত ভেদ করে ধীরেনের সকরুণ আহ্বানকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো।

ধীরেন যখন দেখলে, অমিতা কিছুতেই আর সাড়া দেয় না, তখ সে উঠলো একজন ডাক্তার ডেকে এনে এ বিপদের ব্যবস্থা কর্বার জন্য

(২৮)

সেই গলিতেই সৌভাগ্যক্রমে একটি ডাক্তারের বাড়ী ছিল; ধীরে তাঁকে অনেক ডাকাডাকি ক'রে জাগিয়ে তুললো, এবং সঙ্গে করে নি এসে রোগিণীকে যে-কোনও উপায়ে বাঁচাবার জন্যে সকাতর অনুরো করতে লাগলো।

ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ি থেকে যন্ত্র এনে, তাই দিয়ে অনেকটা আফিং পেট থেকে বাহির করে ফেললেন। তিনি ধীরেনকে অনেক ক'রে বললেন রুগিণীকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে। ধীরেনবাবু সেই বারশো টাকার থলিটি সম্মুখে রেখে বললো :—

"এই থলিতে বারশো টাকা আছে; সব আপনাকে দেবো, যদি আপনি এই রুগীকে বাঁচাতে পারেন। আপনি দরকার মত নার্স নিয়ে আসুন, আরও ডাক্তার আনুন,—কিন্তু রুগী বাঁচান। হাঁসপাতালে আমি এঁকে দিতে ইচ্ছা করিনে।"

ডাক্তারবাবু একটু অবজ্ঞার হাঁসি হেঁসে বললেন : টাকায় কি মানুষ ফেরে মশায়?...ইনি বাঁচবেন না; আমি কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না।

একথা শুনে ধীরেন একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। এখন সে একটু একটু করে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো, অমিতার মহত্ব কোন্ খানটায়; সে সতীত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিল, স্বামীর কাছে যে-প্রতিশ্রুতি সে করেছে, সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে। সে বুঝলো অমিতা সতীত্বের চেয়ে নারীত্বকে বড় দেখে .. বিধবা বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, কাজেই ধর্ম্মের চোখে সে কলঙ্কিত নয়! কিন্তু তবু স্বামীকে যে নারী সত্যই ভালবাসে, সেতো অন্য পুরুষকে বরণ করবে না। চাতক মেঘের জল খায়, পুকুরের জল সুস্বাদু হলেও পান করে না। তাই বুঝি অমিতা আত্ম-হত্যা ক'রে আপনার আত্মার আদেশ পালন করলে।...

প্রভাত হতে না হতে অমিতার নীলবর্ণ মুখ একেবারেই স্থির হয়ে গেল। ধীরেন আত্মহারা হয়ে সেই শবদেহের উপর আছড়ে পড়লো।

সব শেষ হয়ে গেলে, ধীরেনবাবু অমিতার এক বৎসরের খোকাটিকে কোলে ক'রে নিয়ে আপনার বাড়ীতে ফিরলো। বৃদ্ধা পিসিমাকে ডেকে, তাঁর কোলে তাকে দিয়ে, বললে: পিসিমা? এটি এক বড় অভাগিনীর ছেলে। তোমাকে এটি পালন কর্তে হবে।

—তুই এ ছেলেটি কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলি, ধীরেন?

কুড়িয়ে আনিনি পিসিমা! আমি নিঃসন্তান ব'লে ভগবান আমায় যৌতুক পাঠিয়ে দিয়েছেন!

(২৯)

ছেলেটি একবছরের কিন্তু তার চক্ষু দু'টি যেন অনেক বছরের। ঐ মুকুর দু'টির দিকে তাকালে ধীরেনবাবুর অনেক অতীত কথা মনে এসে যায় ক্ষিপ্র-চলমান ছায়াচিত্রের ছবির মত। অমিতা যেন সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ঐ চক্ষু দু'টির ভিতর দিয়ে অবিরতই উঁকি মারতে থাকে।

ধীরেনের পিসিমা বুড়ী হ'লেও এই ছেলেটিকে কোলে পেয়ে যেন ইহকালের নূতন ডাক আবার কাণে শুনতে পেলেন। খেয়া-ঘাটের নৌকায় চড়েও তিনি খেয়ার মাঝিকে বললেন: "ওগো, নৌকা ভিড়োও, নৌকা ভিড়োও! আমার এখন যাওয়া হবে না! আমি আরও কিছুদিন এ-পারে থেকে ঐ নতুন ফুলগাছটির গন্ধ শুকবো। উটি বুঝি ভগবানের দেওয়া পারিজাত গাছ!"

পিসিমা তাঁর শুখনো বুকে এই সরস চন্দন-লতাটিকে নিয়ে বড়ই আনন্দে খোকাকে লালন পালন করতে লাগলেন। স্নেহেই মানুষের আনন্দ! মায়াই মানুষকে জীবনের মরু-পথে নির্ম্মল-ঝর্ণা-ঝরুত মরু-

তানের সন্তান দেয়। তখন হতাশার অন্ধকারে উঠে নূতন আশার নব-চাঁদ, বিষাদের পল্লব-গুচ্ছের মধ্য হ'তে বসন্ত-কোকিল কুহু-রব শোনায়, উষ্ণ-শ্বাস নিদাঘ-বায়ু থেমে গিয়ে বহিতে আরম্ভ করে স্নিগ্ধ স্পর্শ মলয় বাতাস!...ধীরেনের বুড়ী পিসি ক্লান্ত জীবনের শেষ পুটলিটি তুলে রেখে নতুন ক'রে আরম্ভ করলেন পরের খোকাকে প্রতিপালন করতে।

ধীরেনের পয়সার অসচ্ছলতা নাই; সে একজন কণ্ঠ ধাত্রী ও দুইজন পরিচারিকা নিযুক্ত করলে খোকার পরিচর্য্যায়।

খোকার নাম ছিল 'খোকন"। অমিতা তাকে ঐ আখ্যাতেই ডাকতো। তার অন্য নামকরণ সে ক'রে যেতে পারে নি, স্বামীর অসুখে ছোটা-ছুটি ক'রে। ধীরেনবাবু অমিতার মুখ থেকে শুনেছিল অনেকবার ঐ নামে তাকে ডাকতে। কাজেই বিগত আত্মার স্মৃতির খাতিরে সেও ঐ নাম ধ'রে ডাকতে লাগলো অমিতার খোকাকে।

বাহিরের কাজ-কর্ম্ম থেকে ফিরে এসে ধীরেনবাবু একেবারে খোকনের ঘরে এসে ঢুকতো, সেখানে ধাত্রী ও পরিচারিকা হাজার রকমের পুতুল আর রঙ-বেরঙের খেলনা নিয়ে নন্দন কাননের সৃষ্টি করে রাখতো। ধীরেন খোকনকে কোলে তুলে নিত যেন অতীতকে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দেখবার মত ক'রে,—চুমু খেতো পঞ্চাশবার, বুকের স্নেহ যেন মূর্ত্তিমন্ত ক'রে ঢেলে দেবার জন্যে,—নাচাতো দুই হাতে ক'রে তুলে,—দোলায় দোল দিত আর শিশু-ছড়া আওড়াতো কোনও যুবতী জননীর মত অভিনয় ক'রে!

যাদের নিজের কোন ঔরস-জাত সন্তান নেই, তারা অপরের সন্তানকে ভালবাসতে আরম্ভ করলে স্নেহের বন্যায় শিশুকে ভাসিয়ে দেয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হ'লে, শ্রাবণ ও ভাদ্রে যে বর্ষণ আরম্ভ হয়, তাহা অবিরত ও অশ্রান্ত ধারায় হ'তে থাকে।

ধীরেনবাবু খোকনকে এতো ভালবাসতে আরম্ভ করলো, যে বৈষয়িক কর্ম্মে পর্য্যন্ত তার এলো আলস্য ও শিথিলতা।

(৩০)

খোকন ক্রমশঃই বেড়ে উঠতে লাগলো, যেমন গাছের অঙ্কুর বেড়ে উঠে কিশলয়ে, কিশলয় বেড়ে উঠে পল্লবে, পল্লব শাখা প্রশাখায়, শাখা প্রশাখা বেড়ে হয় প্রকাণ্ড মহীরুহ!

খোকনের যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন তার খুব ঘটা ক'রে হলো হাতে-খড়ি। অনেক লোক নিমন্ত্রণ খেলো, অনেক অনাথ ও ভিক্ষুক কুচ্‌কি-কণ্ঠা আহার ক'রে খোকনকে দিয়ে গেল অজস্র আশীর্ব্বাদ! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! খোকন হাতে খড়ি নিয়ে কাকের ছানা বকের ছানা আঁকতে লাগলো, বর্ণমালার কোনও বর্ণ শিক্ষা করলে না।

পিসিমা বুদ্ধিমতী! তিনি ধীরেনকে বললেন, ছেলেটার এখন থেকে মাথা খেয়ো না। ওকে হয় স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও,— না হয় একজন ঝুনো মাষ্টার লাগিয়ে দাও, বাড়ীতে এসে পড়িয়ে যান।

ধীরেন শেষোক্ত উপায়টিই প্রথমে লাগালো। কিন্তু তাতে দেখলো, ছেলে কেবল কাঁদে ও কান মলা খায়; লেখা-পড়ার দিকে বিশেষ এগোয় না। ধীরেন গৃহ-শিক্ষককে বারণ করলো তাকে কোন শারীরিক যন্ত্রণা দিতে। কিন্তু তাতে ফল হলো অন্যরকম! নৌকো লগির ঠেলা না পাওয়াতে, যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই খানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কাজেই অবস্থা দেখে-শুনে ধীরেনবাবু খোকনকে শেষে স্কুলেই ভর্ত্তি করে দিল; তাতে ফল হলো অপ্রত্যাশিত রকমের। স্কুলের শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা

ও নিরপেক্ষতার প্রভাবে আদুরে ছেলে খোকন অত্যাশ্চর্য্য রকমের উন্নতি করতে লাগলো।

পিসিমা বিদায় নিলেন শীঘ্রই, দেহ ও স্নেহ দুই থেকেই একেবারে মুক্ত হয়ে। খোকনের মনে একটা বড় রকমের ধাক্কা লাগলো বটে, কিন্তু অন্যদিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হলো। আদর করবার কেউ নেই, কাজেই বালকের আকাঙ্ক্ষী মন নিজের বুদ্ধির কাছেই আবদার নিতে আরম্ভ করলো। ধীরেনবাবুও প্রায় বিষয়-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকতো, কাজেই খোকন বাল্যকাল থেকেই আপনার বুদ্ধিকে শাণ দিতে লাগলো নির্জ্জন, একাগ্র পাঠানুবর্ত্তিতায়।

স্কুলের পড়া শেষ করলো, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিল বেশ ভাল ভাবেই। কলেজে ভর্ত্তি হলো, সেখান থেকেও আই-এ পাশ করলো উচ্চ শ্রেণীতে।

বয়স যখন আঠারো, তখন একদিন ধীরেনবাবু খোকনকে কাছে ডেকে, বেশ আদর করে বললো "দেখো খোকন! তোমার মা যখন মারা যান, তখন তুমি মাত্র এক বৎসরের শিশু। আর আজ তুমি সাবালক। তাই তোমার মায়ের গচ্ছিত কতকগুলো জিনিষ তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। সেগুলো অনেকদিন বাক্স-বন্দী পড়ে আছে, আমি কখনো খুলেও দেখিনি!...ঐ ছোট কুঠুরীতে তোমার মায়ের একটা তোরঙ্গ আর দুটো বাক্স আছে।...এই চাবির গোছা নাও,—খুলে দেখো, তোমার মা তোমার জন্যে স্মৃতি-চিহ্ন কি রেখে গেছেন!"

এক-গোছা পুরানো চাবির থোলো ধীরেনবাবু হাতে ক'রে তুলে দিল খোকনকে! খোকন এতদিন কখনও শোনেই নি যে তার পরলোক-গত

মা তার জন্যে কিছু রেখে গেছেন। পিসিমা মাঝে-মাঝে বলতেন বটে, কিন্তু ধীরেনবাবু কথাটা গায়ে মাখতো না বা চাবি খুলে সেগুলো দেখাতো না। ওটা যেন একটা পবিত্র সংরক্ষিত জিনিষ, এই ভাবেই ব্যাপারটা বরাবর চলে আসছিল।

খোকন জানে, তার মা নেই বাপ আছেন। ধীরেনবাবুকেই সে বাপ ব'লে জানে, এবং সেই আখ্যাতেই তাকে ডাকতো। মায়ের ছবি মাঝে মাঝে সে নিজের মনে আঁকবার চেষ্টা করতো কিন্তু পারতো না। কতোবার সে পিসিমাকে ও ধীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছে তার মা কেমন দেখতে ছিলেন, তাঁর ছবি নেই কেন,—ইত্যাদি কথা! কিন্তু ধীরেন প্রায় কথাটা চাপা দিত, এবং পিসিমাকেও বলে দিতো, তার মার কোন বিষয়ের কথা তিনি যখন জানেন না তখন খোকনকে যেন ও-বিষয়ে কোনও ভুল আভাস না দেন।

ফলে, খোকন বাবাকেই চিনতো, মা কে নয়! মানুষের ভালবাসা বড় স্বার্থান্বেষী! খোকোন যাতে তাকেই সমস্ত ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরে,—তার মা, বাপ, দু'জনেরই প্রাপ্য ভালবাসা যাতে শুধু তাকেই দেয়,—এই উদ্দেশ্যে, এই লোভে ধীরেনবাবু খোকনের মনে মায়ের ছবি আঁকতে চায়নি—ও দিকটা একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিল।

কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এমনই কৌশল যে মাতৃ-হীন বালকের মন আপনা থেকেই খুঁজে বেড়াতো মায়ের ছবি, মা'য়ের আদরের পরশ। কি নাই,-কি একটা থাকা উচিত ছিল,-এমনি একটা সন্ধানে খোকনের মন আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠতো। ক্লাশের সহপাঠী ছেলেদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেছে সে,-তাদের মা রয়েছেন, কতো আদর করছেন! কাজেই ঐ জিনিষটার জন্যে সে আপনাকে নিতান্তই রিক্ত ব'লে বিবেচনা করতো।

তার মা তার জন্তে কিছু স্মৃতি-চিহ্ন রেখে গেছেন, এই কথাটা ধীরেনবাবুর কাছে শুনেই খোকন যেন একটা স্বপ্নের জিনিষ হাতের মুঠোর মধ্যে অনুভব করিতে লাগলো। কতোদিন সে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্নে দেখেছে তার মা তার কাছে এসেছেন,—তাকে কোলে তুলে কতো আদর কচ্চেন,—কতো ঘুম-পাড়ানি গান শোনাচ্চেন। খোকন মূর্ত্তিটা ঠিক নিছক আকৃতিতে দেখতে পেতোনা, কিন্তু মা যে খুব সুন্দরী এবং অপর সহপাঠী বন্ধুদের মায়েদের মতনই স্নেহময়ী দেবী-সদৃশ,—এটা সে বেশ অনুভব করতে পারতো। ঘুমের স্বপ্নের মাঝে কতো কথাই মা বলতেন খোকনকে,-খোকোন তা শুনতে পেতো; কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলেই সেই ছায়াময়ী আকৃতি এবং তাঁর আদরের চুম্বন ও ছড়ার আবৃত্তি কোথায় মিলিয়ে যেতো,—খোকোন সেজন্তে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়তো! সে ভাবতো, হায়! স্বপ্নগুলো যদি সত্যি হোতো!

জীব-জগতের ঐখানেই দৌর্বল্য। তার স্বপ্ন কি কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় না। সে যেটা বড়ই আকাংক্ষা করে, সেইটাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, পৃথিবীর দিগন্তের মত। মানুষ দিগন্তকে চোখে দেখে, কিন্তু হাতে পায় না। মনে হয়, বুঝি আর কিছু ক্রোশ এগিয়ে গেলেই, ঐ পৃথিবী আর আকাশের মিলনের জায়গাটায় সে পৌঁছে যাবে! যেখানে ভোরবেলায় সূর্যোদয় হয়, সন্ধ্যাকালে হয় সূর্য্যাস্ত,—যেখানে সমুদ্র গিয়ে আকাশের কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,—যেখানে গাছ পালা পাহাড় পৃথিবীর মায়ার প্রতিবিম্বের মত অঙ্কিত থাকে,—সেই স্থানটা না জানি কতই অপূর্ব্ব, কতই অলৌকিক সুন্দর! কিন্তু ধরাছোঁ কিছুতেই দেয় না এই মনোরম স্থান, সীমাবদ্ধ শক্তির মানুষকে! দেখা দেয়, কিন্তু ধরা দেয় না! বাস্তবদের সঙ্গে তার চিরদিনের শত্রুতা!

নিদ্রার যে দুরপনেয় যবনিকা আছে, তারই আড়ালে স্বপ্নের চিরদিনের লুকোচুরি খেলা !

খোকোন ধীরেনবাবুর কাছে চাবির গোছা পেয়ে ভাবলে বুঝি সে স্বপ্নের চাবি পেয়েছে ! তার মা সত্য সত্যই আজ তাকে ধরা দেবেন। মাতৃহীন যুবক জানতো না যে, যতো স্নেহেরই মা হন,—একবার জীবন-জগতের বাহিরে চলে গেলে আর তাঁর ফিরে আসা, ভগবানের দর্শনের মতই অ-প্রত্যক্ষ ও অনৈসর্গিক !

তাড়াতাড়ি কুঠুরী ঘরের দ্বারে গিয়ে সে চাবি দিয়ে খুললো। এবং ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলো, সত্যই একটা তোরঙ্গ রয়েছে ধূলি ধূসরিত ও ঊর্ণনাভ-জালে সমাচ্ছন্ন। তাড়াতাড়ি উপরটা পরিষ্কার ক'রে, চাবি লাগিয়ে খুলে ফেললো তোরঙ্গটা।

খুলে দেখলো, তার ভিতরে রয়েছে কতকগুলো পুরাতন কাপড় চোপড়, আর শৈশব-বয়েসের ব্যবহৃত দু'একটি ছোট জামা ! এ সবের ভাঁজের মধ্যে হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো, একখানা চিঠি।

শিরোনামায় নাম লেখা রয়েছে 'খোকোন !' সেই লেখাটুকু পড়ে খোকোন বড় অধীর হয়ে পড়লো। বহুদিন-হারানো বহু-মূল্য একটা জিনিষ হঠাৎ খুঁজে পেলে মানুষ যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মায়ের হাতের লেখা দেখে তেমনি সে হয়ে পড়লো বড়ই উতলা ! মায়ের নিজ-হাতের লেখা হয়তো !

তাড়াতাড়ি খুলে ফেললো চিঠিখানা। তাতে যা লেখা রয়েছে মাতৃ-হারা সন্তান তখনই সেটা পড়ে ফেললো, কতো আশা, কতো উচ্ছ্বাস, কতো কৌতূহল নিয়ে ! তার মা যেন সত্যসত্যই সেই চিঠির ভেতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ ক'রে খোকনের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে এইরকম :—

"আমার খোকন,-আমার জীবনের শেষ টুকরো!

তুমি যখন এই চিঠি-খানা পড়বে,—তখন হয়তো আমি তোমার নাগালের বাহিরে! তখন হয়তো আমি থাকবো এমন-এক দেশে, যেখান-থেকে আমি তোমায় কোলে নিতে পারবো না,—তোমাকে চুমু খেতে পাবো না, তোমাকে কোনোরকম আদর কর্তেই পা'বো না। কিন্তু তবু বিশ্বাস করো খোকোন, আমি অদৃশ্য মূর্ত্তি নিয়ে তোমার চারিদিকে সর্ব্বদাই হাজির থাকবো, আর তোমাকে আমার সমস্ত অস্তিত্ব নিংড়ে আশীর্ব্বাদ করতে থাকবো-আর ভগবানের কাছে তোমার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করতে থাকবো!

"খোকন, একটি বিশেষ কথা আছে,—সেই কথাটি তোমাকে চিঠিতে লিখে যাচ্ছি।...তুমি যখন মাত্র দেড়-বৎসরের শিশু.-যখন এই অভাগিনীর কোলে তুমি দেব-দূত হয়ে নাচছো,—তখন তোমার বাপের একটা দুরারোগ্য অসুখ হয়। অনেক ঔষধ-পত্র খেয়েও যখন তাঁর কোনও উপশম হলো না, তখন ডাক্তারেরা উপদেশ দিল, বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাবার জন্যে। কিন্তু অন্তরায় হ'লো তাঁর টাকার অভাব। সামান্য চাকরি করতেন তিনি,-কাজেই সঞ্চয় তাঁর কিছু ছিল না।...

"এমন সময়ে এক মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি পর হয়েও তাঁকে ধার দিল এক হাজার টাকা। তোমার বাবা সেই টাকা নিয়ে গেলেন শিমুলতলায়, কিন্তু ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন না।...মৃত্যুর আগে তিনি অনবরত ভাবতেন ঐ ঋণের কথা! ঋণ-পরিশোধ না হ'লে তাঁর আত্মা কিছুতেই সদ্গতি পাবে না, এই-কথা তিনি বার বার বলতেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে তিনি আমাকে বার বার আদেশ করে যান, যা-করে-হোক ধীরেন-বাবুর এক হাজার টাকা ঋণ যেন শোধ করে দিই। যে পরোপকারী উচ্চ-হৃদয়

ব্যক্তি তাঁকে সামান্য হাত-চিঠিতে একহাজার-টাকা ধার দিয়েছিলেন, তাঁর নাম ধীরেনবাবু।

"তোমার বাবা তো শরীরের ঋণ চিতার আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন কিন্তু টাকার ঋণ গচ্ছিত রেখে গেলেন আমার কাছে! আমি কোথা থেকে ঋণ-শোধ দেবো? আমি মেয়ে মানুষ—কোনো উপায়ই তো নেই আমার টাকা যোগাড় কর্‌বার!... কিন্তু তবু এক কৌশল ক'রে ধীরেনবাবুকে শোধ দেই ঐ টাকাটা!... আমার তখন একমাত্র ধর্ম্ম স্বামীর প্রতিশ্রুতি রাখা! সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই তখন লুপ্ত হয়ে একমাত্র স্বামীর ঋণ শোধ করাই আমার ক্ষুদ্র চিত্তাকাশে একমাত্র জ্যোতিষ্ক হয়ে দাঁড়ালো।...যে কৌশলে ঋণ শোধ করলাম, সেটা যে শুধু পর-প্রবঞ্চনা তা নয়; আত্ম-প্রবঞ্চনাও বটে! প্রতারণায় ঋণ—পরিশোধ যথার্থ হয় না! তাই, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, খোকন, তুমি যদি ক'রে পারো, আমাদের পরম হিতৈষী ধীরেন বাবুকে তোমার পিতৃ-ঋণ পরিশোধ ক'রে দিও। আশীর্ব্বাদ করি,—প্রাণের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি—তুমি জীবনে এ টাকটা রোজগার ও সঞ্চয় করতে পারবে,—আর তোমার বাপ মায়ের শেষ পিণ্ড গয়ায় না দিয়ে ধীরেন বাবুর পাদ-পদ্মে এক হাজার টাকা দিয়ে সম্পন্ন কোরো! তা'হলে আমাদের আত্মার সদ্গতি হবে।

"খোকন, তোমার বাপের শেষ নিঃশ্বাস,—এবং তোমার মায়ের একমাত্র নিবেদন,—এই ঋণ-পরিশোধ।

ইতি তোমার "মা"।

দু'বার, তিনবার চিঠিখানা পড়লে খোকন। যতক্ষণ চিঠি খানা পড়তে লাগলো, ততক্ষণ তার মনে হলো, তার মা তার সঙ্গে কথা কইছেন। তিনি

পড়া শেষ হয়ে গেলেও সে অনুভব করতে লাগলো তার মা তারসম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার মুখের উত্তর শোনবার জন্যে! সে যে দিকে চোখ ফেরায়, সেই দিকে দেখতে পায় তার মাকে—স্নেহ করুণার্দ্র মুখে,—সাশ্রু নয়নে—স-কাকুতি ভঙ্গিমায়! মা'র পরনে সধবার চিহ্ন শাড়ি নাই,—হাতে সুবর্ণ কঙ্কন নাই, এমন কি শাঁখাও নাই, মাথার সিঁথিতে ঊষা-রক্তিম সূর্য্যের মত সিন্দুর রেখা নাই। তার মা শীর্ণ, রুক্ষ, ঋণ-ভারে ভগ্ন-মেরুদণ্ড! এই মা তার কাছে ভিক্ষা চাইছেন ঋণ পরিশোধ! এই মা তাকে হাতে শৃঙ্খল দেখিয়ে বলচেন, স্বর্গে এসেও ঋণের দায়ে তাঁর কয়েদ হয়েছে। তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হয় নি, তার বাপেরও নয়।

তার মায়ের এই অবস্থা,—আর তার নিজের? সে তো বেশ আনন্দে উৎসবে রাজপুত্রের মতো নানা সুখ-সম্ভোগে দিন কাটাচ্ছে! যাঁর কাছে ঋণের জন্যে তার মা স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাচ্ছেন না,-স্বর্গে গিয়েও তুষকাষ্ঠ লোকের মত ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছেন,—তাঁরই স্বয়ং-দত্ত অর্থে সে বাবুয়ানা কচ্চে, পড়াশুনা কচ্চে ও করেছে—বিলাসের নাগর-দোলায় দোল খাচ্ছে! ধীরেনবাবু! তাঁকে সে বাবা ব'লে ডাকে।...এতো বড়ো মিথ্যেটা এতদিন সে চালিয়ে এসেছে। শুধু অজ্ঞানতা-বশতঃ। কিন্তু তাইতো সত্যি নয়! ধীরেনবাবু তো তার পিতা নয়,-অন্ততঃ জন্মদাতা পিতা নয়,—পালক পিতা হতে পারেন! তার প্রকৃত পিতা—তার অতি শিশুকালেই গেছেন মারা। এবং যাঁরা বাবার সময়ে ঋণ-রেখে গেছেন ধীরেনবাবুর কাছে! সুতরাং ধীরেনবাবুর জন্যেই তার বাপ-মা শান্তি পাচ্ছেন না পর-লোকে গিয়েও। তবে আর ধীরেনবাবুর কাছে সে আর থাকে কেমন করে? তাঁকে বাপ ব'লেই বা ডাকে কেমন করে? কি লজ্জা, পরকে যে বাবা ব'লে ডাকে, বাবা ব'লে জানে,

অথচ তাঁর কাছে সে যৎপরোনাস্তি ঋণী, খোকনের মাথা ঘুলিয়ে গেল এই সব কথা মনে মনে আলোচনা করতে করতে।

সেদিন আর কলেজ গেলো না খোকন, সে বি, এ, ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছে,—কিন্তু জীবনের এতো বড়ো প্রশ্নের কাছে কিসের পড়াশুনো ? তার মা "স্বামীর ঋণ" পরিশোধ কর্ব্বার জন্যে হাওয়াতে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছেন,—আর সে কি ক'রে সেই খাতকের অর্থে পড়াশুনো করতে পারে ? "মা ? মা ? কি কর্ব্বো ব'লে দাও, কি ক'রে তোমার ঋণ-পরিশোধ করি ব'লে দাও,"...হঠাৎ যুবক খোকন আকাশের দিকে তাকিয়ে, কর-যোড়ে জিজ্ঞাসু নয়নে এই প্রশ্নটা বার বার করতে লাগলো।

কলেজে না যাওয়াতে ধীরেনবাবু খবর নিলেন, কেন সে আজ পড়তে গেলো না। খোকন, চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালে শরীরটা আজ ভাল নয়।

মধ্যাহ্নে সে আহার করলে না। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো পিতৃ-ঋণ-পরিশোধের উপায়, একাকী ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে তার অনবরত মনে হতে লাগলো, মা তার কাঁদচেন। হাঁ কাঁদচেন, নিতান্ত চাপা গলায় অসহায়া রমণীর মতো. মা'র মুখ-খানা সে বারম্বার দেখতে পেলো, ব্যর্থ জীবনা অভাগিনীর মুখ যেমন দেখতে হয়, ঠিক সেই-রকম। পুত্রের দিকে মা অনবরত চাইচেন সাহায্যের জন্য, আর পুত্র তাঁর প্রার্থনা কাণেও শুনচেনা, জিজ্ঞাসাও কচ্চে না। খোকোন অবিরত ধিক্কার দিতে লাগলো নিজেকে।

মানুষ যখন কোন অত্যুগ্র সক্রিয় মনোবৃত্তির প্রকোপে পড়ে, তখন তার অন্য-সকল মনোবৃত্তি চাপা পড়ে যায় তারই চাপে। শরীরের কোনও যন্ত্রের ক্রিয়া অত্যধিক চলতে থাকলে, অন্য-সকল যন্ত্র-গুলি

বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। ফুস্-ফুসে ক্রিয়া অত্যধিক চলতে থাকলে, হৃদ্-যন্ত্র, পাক-যন্ত্র, মূত্র-যন্ত্র সবই ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঠিক সেই ভাবেই, মনের মধ্যে কোনও চিন্তা অপরিসীম ও অনিয়মিত গতিতে চলতে থাকলে, অপর সকল বৃত্তি ক্রমশঃ মন্থর ও অক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষের যখন এই অবস্থা ঘটে, তখন তার শুভাশুভ বিবেচনা কার্য্যাকার্য্য-বোধ প্রায় মন্দীভূত হয়ে যায়। জীবনের নানা দিকের সামঞ্জস্য-সাধন, বিচার-বুদ্ধি, ভবিষ্যৎ পরিণাম-চিন্তা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় তার। উন্মাদ অবস্থা হতে এ অবস্থার কোনো প্রভেদ থাকে না। এক কথায় কার্য্যতঃ সে উন্মাদই হয়ে পড়ে।

খোকোন অসুখের ছল ক'রে, ঘরের দরজা বন্দ রেখে, সমস্ত দিন ভাবতে লাগলো তার পিতৃ-ঋণ পরিশোধের কথা, কি করলে সে এখন থেকেই টাকা রোজগার করতে পারবে, সেই টাকা জমিয়ে জমিয়ে কি ক'রে একহাজার টাকা সে সংগ্রহ করতে পারবে, তার পরে কি ক'রে সেই টাকাটা এনে সে 'পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ' ব'লে তার পালক-পিতাকে অর্পণ করবে, এই সব কথা সে ক্রমাগতই ভাবতে লাগলো।

অপরাহ্ণ গিয়ে সন্ধ্যা এলো, খোকন ঘরের দরজা খুললো না। যখন ধীরেনবাবু নিজে এসে ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন, তখন একবার সে বিছানা থেকে উঠে—দরজা খুলে দিলে। ধীরেন বাবু জিজ্ঞাসা করলো :

'কি হয়েছে রে খোকন ?

'কিছু হয়নি তো !'

'তবে, সমস্ত দিন দরজা বন্দ ক'রে ঘরে শুয়ে রয়েছিস্ ?'

'শরীরটা অল্প একটু খারাপ !'

'ডাক্তার ডেকে আনি ?'

'আপনার পয়সা অনেক, তাই ডাক্তার ডেকে আনতে চাইছেন? কিন্তু আমি যাঁর ছেলে, তিনি থাকলে একথা তুলতেন না।

শেষ কথাগুলো খোকন একটু অস্পষ্ট স্বরে বললে। কা'কে যে সে-কথাগুলো বলছে, তা খেয়াল হতেই খোকানের গলা আপনা থেকেই অকুচ্চ ও জড়িত হয়ে এসেছিল। তবু কথাগুলোর খানিকটা উত্তাপ ধীরেন-বাবুর কানে গিয়ে লাগলো। প্রৌঢ় ব্যক্তি ঠিক সমস্ত অর্থটা না ধরতে পেরে বললেন: কি বললি, বুঝতে পারলুম না।

যুবক খোকন মুখ ফিরিয়ে, ওষ্ঠাধর একটু কুঞ্চিত ক'রে বললে: না, কিছু নয়, সামান্য অসুখে ডাক্তার ডাকতে হবে না।

তবু ধীরেনবাবু বললেন: তা হোক, তবু একবার তিনি দেখে যা'ন।

খোকোন্ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ধীরেন বাবুকে সে ভক্তি করতো, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-সহকারেই কথা কইতো। কিন্তু তবু, মায়ের চিঠি পড়া অবধি তার কাছে তার আঠারো বছরের বাপ হঠাৎ উপে গেছে, সেই পবিত্র স্থানে বসেছেন এক অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অতীত মানুষ,—যিনি টাকা ধার ক'রে শোধ দিতে না পারাতেই মারা গেছেন। ধীরেনবাবু আজ খোকনের কাছে ধীরেনবাবুই হয়ে গেছেন,—বাপ নন, পর, তাই, অবিরত ডাক্তার ডেকে আনবার প্রস্তাব করতেই, ইঞ্জনের নতুন আগুনটা যেন হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো, চাপা সঞ্চিত মেঘে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ঘটলো। খোকোন ধীরেন বাবুর আগ্রহাতিশয্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললে:—আঃ! বিরক্ত কর্বেন না! কেন তবু শুধু জ্বালাতন কচ্ছেন?

ধীরেন পিতার প্রাণ দিয়েই খোকনকে এতদিন মানুষ করেছেন। তিনি হঠাৎ চমকে উঠলেন খোকনের এই অপ্রত্যাশিত ভাবে উত্তেজিত উত্তরে।

ধীরেন বাবু সরে এলেন খোকনের কাছ থেকে ; কিন্তু নিতান্ত ব্যথিত অন্তরে, তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না, কি ক'রে গলায় লম্বমান স্বর্ণ-হার হঠাৎ কৃষ্ণসর্পে পরিণত হ'লো ? যা'কে স্পর্শ-ক্ষম রত্ন ব'লে জানতেন, সেটা হঠাৎ হয়ে দাঁড়ালো একেবারে অঙ্গুলি-দাহকারী হুতাশন !

(৩০)

সমস্ত রাত্রি খোকনের চক্ষে নিদ্রা নাই ! সে যতোবার চক্ষু বুজোয়, ততোবার অন্ধকারের মধ্যে ফুটে ওঠে তার মার ব্যথা-ক্লিষ্ট দেহ-খানি। তিনি তাঁর দক্ষিন হস্তের অঙ্গুলি বাড়িয়ে তাকে যেন নির্দেশ দিচ্ছেন, "টাকা রোজগারের জন্যে বেরিয়ে পড় খোকন। বাহির জগতে টাকার অভাব নাই। পথের ধূলিতে মিশিয়ে রয়েছে টাকার রাশি। শুধু কুড়িয়ে নিলেই হয়!" চম্‌কে উঠে খোকন আপনার চক্ষু-খোলে। কিন্তু মায়ের মূর্ত্তি মিশায় না! সেই স্নেহ-কোমল অথচ সংকল্প-দৃঢ়, হাস্যময় অথচ বিষাদাপ্লুত মাতৃ-মূর্ত্তি !

ঘরের দীপ কখনও নিবিয়ে দিয়ে খোকন শুয়ে পড়ে কখনো আবার জ্বালে। কখনও বদ্ধ ঘরের উত্তাপে জানালা খুলে দেয়, কখনও গৃহগামী বায়ুর শীতলতায় জানলা বন্ধ করে দেয়। নিদ্রা তার কিছুতেই হলো না সমস্ত রাত ! অনবরত বহির্জগতের আহবানে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

প্রভাত হতে না হতে ধীরেনবাবু চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন খবর নিতে, খোকন আজ সকালে কেমন আছে। চাকর ফিরে গিয়ে সংবাদ দিল, 'দাদা-বাবুর ঘর খোলা। তিনি নাই।"

নাই ? কোথায় গেল ? ধীরেন-বাবু নিজে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে,

খোকনকে না দেখতে পেয়ে, পাগলের মত উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাড়ীর প্রাচীর গুলোই শুধু তাঁর ডাকের প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিল।

কর্ম্মচারীগণ, দাস-দাসী, লোক-লস্কর সকলে ছুটলো দাদাবাবুর সন্ধানে। কিন্তু কেউ কোন সম্বাদ নিয়ে ফিরতে পারলে না। সকলেই ঘুরে ফিরে এসে বললে, কোথায়ও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

স্নেহ বিপদাশঙ্কী। ধীরেনবাবু পুত্রের একটা আকস্মিক ঘোর বিপদের কথা আশঙ্কা করতে লাগলেন।

খোকনের কলেজে তার প্রফেসরদের নিকট, তার সাধা বন্ধুবর্গ ও সতীর্থ দিগের নিকট, অনুসন্ধান করা হলো। সকলেই তার স্মিক অন্তর্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করলো, কোন সংবাদের টুকরো দিয়ে ধীরেনবাবুর প্রাণে সান্ত্বনা এনে দিল না।

তখন ধীরেনবাবুর হৃদয়ের মর্ম্ম-তন্ত্রীতে এক বিষাদের আঘাত লাগলো।

ধীরেনবাবুর জীবনে আপনার বলতে আর কেহ ছিল না। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। যে সব মাটিতে মায়া-লতা আপনি গজিয়ে ওঠে, সে সব মাটি তাঁর জীবন-তরুর গোড়ায় কখনও পড়েনি; শুধু ধার-করা নিঃসহায় একটি ছেলে তাঁর মায়ার একমাত্র বস্তু ছিল। সেইটিকে নিয়েই তিনি এতদিন সংসার উদ্যানে শাখা-পত্র-বায়ু-আলোকে দোল খাচ্ছিলেন। আজ হঠাৎ সে'টি ক্রোড়ের ভেতর না পাওয়াতে ধীরেন বাবু একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

যখন কাছাকাছি কোথায়ও খোকনকে খুজে পাওয়া গেল না, তখন দৈনিক সম্বাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না।

যদি কোন ভারি জিনিষ একটি মাত্র সূত্রে ঝোলান থাকে,—এবং

সেই সূত্র কোনো কারণে ছিঁড়ে যায়, তাহা হইলে জিনিষটি একেবারেই ভূমিসাৎ হয়। ধীরেনবাবুরও সেই দশা ঘটলো। প্রথমে তাঁর মানসিক বিষাদ ঘটলো,—তারপরেই আপনার বিষয়কর্ম্ম পরিদর্শনে ঘটলো একান্ত ঔদাসীন্য। কর্ম্মচারীরা সুবিধা বুঝলো। তার যা ফ'ল হয় তাই ঘটতে লাগলো।

এক বৎসর গেল, দু'বৎসর গেল, তিন বৎসর গেল,—খোকনের কোনই সম্বাদ নাই। কিন্তু এদিকে ধীরেনবাবুর বিষয়-সম্পত্তির যথেষ্ট সম্বাদ জড় হলো। তাঁহার জমিদারী খাজনা অধিকাংশ স্থলেই বড়-জমিদারের সেরেস্তায় পৌঁছায় না, নায়েব গোমস্তার চোরাপথে সে টাকা তাদের পকেটেই ধুলো চাপা পড়ে! ফলে, তিন বছর বাদে বড়-জমিদার বাকি-খাজনার নালিশ করলেন। ধীরেন বাবু তা টেরও পেলেন না। তিনি তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোকোন ও অমিতার অতীত স্বপ্ন নিয়ে বিভোর থাকেন! বিশ্বাস-ঘাতক নায়েব গোমস্তা শোকাভিভূত মনিবের একান্ত-নির্ভর অবস্থায় সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে!...তার যা পরিণাম ঘটলো, তাতে ধীরেনবাবুর একেবারে পথে দাঁড়াতে আর বেশী বিলম্ব রইলো না।

এমন সময়ে একদিন এক মনি-অর্ডার এসে হাজির একহাজার টাকার! ঠিকানা :—মেসোপটোমিয়া ওয়ার-ক্যাম্প, তুরস্ক! টাকা পাঠিয়েছে খোকোন! নাম পড়েই ধীরেনবাবু একেবারে লাফিয়ে উঠলেন! তিনবার মণি-অর্ডার ফর্ম্মাটার ওপর চুমু খেলেন।

একখানা চিঠিও সেই সঙ্গে এসে হাজির।

চিঠিতে লেখা :— 'কাকাবাবু'!

কাকাবাবু? ধীরেনবাবু বিস্মিত হলেন এই শিরোনামা পড়ে তবে কি তাঁকে এ চিঠি লেখা নয়?...তবু পড়তে লাগলেন :—

"আমার মায়ের যে পুরানো পরিত্যক্ত একটা তোরঙ্গ ছিল, তার চাবি আপনি আমায় দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমি তোরঙ্গ খুলে মায়ের একখানা চিঠি পাই। তাই পড়ে আমি জানতে পারি, এ হতভাগা আপনার পুত্র নয়। আমার যিনি প্রকৃত পিতা তিনি আপনার কাছে এক হাজার টাকা ধার করে অসুখ সারাতে বায়ু পরিবর্তনে যান সে ঋণ তিনি শোধ না দিয়ে মারা যান। আমার মা চিঠিতে আমাকে আদেশ করেছেন সেই ঋণ শোধ করতে।

আজ সেই ঋণ শোধ স্বরূপে এক হাজার টাকা পাঠাইলাম। আমি শীঘ্রই আপনার কাছে যাইব ও সাক্ষাতে অপর সকল কথা বলিব।

ইতি —

আপনার স্নেহের
(খোকোন)

চিঠি খানা পড়ে ধীরেন বাবুর মাথা ঘুরে গেলো। তিনি একদিকে যেমন মুমূর্ষু অবস্থা থেকে জীবনে ফিরে এলেন খোকনের খবর পেয়ে, তেমনি আবার অস্বাস্থ্য অনুভব করতে লাগলেন খোকন যে তাঁকে আর তার পিতা বলে স্বীকার করতে চায় না তারই কারণ-আবিষ্কারে! তিনি একসঙ্গে মৃত্যুর গহ্বর থেকে ঠেলে উঠলেন, আবার তখনই সেই পিতৃত্ব-হীন জীবন-মৃত্যুর অন্ধকার কূপের মধ্যে পতিত হলেন। হারানো রত্ন খুঁজে পেলেন, কিন্তু দেখলেন তাঁর সে রত্ন বিধি-বিড়ম্বনায় অতি নিকৃষ্ট প্রস্তরে পরিণত হয়েছে। মরকতমণি হয়ে গেছে সাধারণ পাথরের টুকরো! স্নিগ্ধ চন্দন-লতা হয়ে গেছে এরণ্ড গাছ। যাহা ছিল স্পর্শ-শীতল, তাহা হয়ে গেছে অস্পর্শক্ষম অগ্নি সদৃশ!

পোষ্টাফিসের পিয়ন মনি-অর্ডারের ফর্ম ও টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ধীরেনবাবু তাকে বললেন "টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমি মণিঅর্ডার নেবো না"

পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর শুভাকাংক্ষী নায়েব অতুলবাবু। তিনি বললেন :—সে কি বাবু ? টাকার জন্তে আপনার পারুল-গাছার জমিদারি লাটে উঠেছে। হাজার টাকা জমা দিলে এখন নিলেম রদ হয়। এ টাকা ফেরত দিতে আছে বাবু ?

বাবু উত্তর দিলেন "ও টাকা আমার পাওনা টাকা নয়।"

—তবে যে পাঠিয়েছে, সে পাঠালো কেন ?

—খোকোন পাঠিয়েছে ভুল ক'রে।

নায়েব অতুলবাবু বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে বললেন : খোকোন পাঠিয়েছে ? এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি হতে পারে বাবু? খোকাবাবু কোথা আছে বাবু ? ভাল আছে তো ? আঃ ! এতদিন পরে-তার খবর পাওয়া গেল ! কি আনন্দ !

ধীরেনবাবু পরিমিত আনন্দ প্রকাশ ক'রে বললেন, আনন্দ বটে ! কিন্তু আমি তার টাকা নিতে পারবো না।

অতুলবাবু তাড়াতাড়ি বললেন :—সে কি বাবু ? খোকোন বাবু নিশ্চয়ই রোজগার করে টাকা পাঠিয়েছেন !

—তা পাঠিয়েছে।

তবে নেবেন না কেন ? লোকে ছেলের রোজগার নেয় না ? বিশেষ আজ আপনার ভগ্ন দশা। আজ, বলতে নেই, এক হাজার টাকা আপনার কাছে একলাখ টাকা।

ধীরেনবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন : এককোটি টাকা হলেও ও টাকা আমি

নেবো না ।···না হে পিয়নবাবু ।···আপনি যান ! আমি ও টাকা ref।।২০ (নিতে অস্বীকার) করলুম ।

অতুলবাবু কাকুতি মিনতি করে বললেন :—বাবু, বাবু, সর্ব্বনাশ করবেন না ! তবিলে আর একটি টাকা নেই । সমস্ত জমিদারী হাতছাড়া হয়ে গেছে । শুধু পারুলগাছা বাকি ।

সেটাও যাক । তবু আমি ও টাকা নেবো না ।

বাবু ? বাবু ? অবুঝ হবেন না ?

ধীরেনবাবু অতুলবাবুর দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন : অতুলবাবু ? অতুলবাবু চুপ ক'রে গেলেন । তাঁর চোখের কোণে একবিন্দু জল এসে দাঁড়ালো । পিয়ন আস্তে আস্তে চলে গেল ।

৩২

"বাবু ? বাড়ীখানাও আর বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না ।"

ধীরেনবাবু কাণে কথা কয়টি শুনলেন, কিন্তু মনে শুনলেন না । যে অবধি তিনি খোকোনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন, এবং সেই চিঠিতে 'কাকা বাবু' বলে সম্বোধন পড়েছেন,—সেই অবধি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার প্রতি অবহেলা অতি-মাত্রায় বেড়ে গেছে । অতুলবাবু যতো এসে তাঁকে বিষয়-সংক্রান্ত কথা শোনান, ততো তিনি বৈরাগ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন । তাঁর এখন বিশ্বাস হয়েছে, জগতে স্নেহ-ভক্তিই প্রকৃত উপভোগ-যোগ্য বিষয় সম্পত্তি ; মাটি বা টাকার সম্পত্তি মাটির মতই অনির্ভর-যোগ্য । একটা ভূমিকম্পে মাটি কোথায় চলে যায় ঠিক থাকে না, অসতী-স্ত্রীর মত বসুমতী কতো অন্ন-দোষে অপর-পুরুষের দাসীত্ব করে, [illegible]

তাই খোকনের কাছ থেকে যখন ভালবাসা বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাঁর কাছে-স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন তিনি নিঃসার বিষয় সম্পত্তির জন্যে আর হাঁক-পাঁক করলেন না। বৈরাগ্য বা ঔদাস্য এসে তাঁকে পূর্ণমাত্রায় অধিকার করলো। জমিদারী সমস্তই বাকি খাজনায় নিলামে উঠলো; এমন পৈত্রিক বাড়ীখানা পর্য্যন্ত অভিমানভরে অন্য পুরুষের কুক্ষিগত হয়ে গেল।

অতুলবাবু অনেক বোঝালেন, অনেক মতলব বার করলেন। কিন্তু যে একেবারেই সম্পত্তি-রক্ষার জন্য ইচ্ছুক নয়, সেই প্রস্তরে কেমন ক'রে মতলব বা উপদেশ অঙ্কপাত করতে পারে?

মানুষের ঐহিক বিপদ সাধারণতঃ বড় সঙ্গী-প্রিয়। বিপদ এলেই তার সঙ্গে এসে পড়ে অনেকগুলি ছায়া বা হিংস্রক কায়া। দারিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ আসে অপুষ্টিকর খাদ্যের ক্ষতিকর ফল। বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট হয়ে যাওয়াতে বাড়ীর চাকর-বাকর কমে যায়, ধীরেনবাবু কাজেই খাওয়া-দাওয়ায় বড় কষ্ট পেতে লাগলেন। ক্রমে ধীরেনবাবুর বিকালে একটু করে জ্বর দেখা দিতে আরম্ভ করলো, শরীর দিন দিন নিদাঘের পুষ্করিণীর মত শুখিয়ে যেতে লাগলো। ডাক্তার একদিন এসে তাঁকে পরীক্ষা ক'রে যে রোগের সন্দেহ ক'রে গেল সেটা অতি বড়ো শত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিলেন একবার দেশের হাওয়াটা বদলে আসতে। ধীরেন বাবুর হঁা করে মনে পড়ে গেল, অমিতার স্বামী ঈশানবাবুর কথা। তিনি সটান ডাক্তারকে বললেন "ঐ জিনিষটে ছাড়া আর আপনি যা বলবেন কর্ব্বো।"

"কেন. ওটা কর্ব্বেন না কেন?" ডাক্তারবাবু ঠোঁট-কাটা ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"দেখুন ডাক্তারবাবু? সব মানুষ সব সময় সব কারণ ব'লে উঠতে পারে না।... একথাটা মানেন তো?"

"হাঁ, তা মানি।" ডাক্তারবাবু মনে মনে স্বীকার করে নিলেন শারীরিক রোগ সারবার জন্যই তাঁর প্রয়োজন, মানসিক রোগের নয়।

তিনি ঔষুধের একটা লম্বা ফর্দ্দ আর পথ্য বিষয়ে একটা খাটো তালিকা করে দিয়েই সরে পড়লেন।

অতুলবাবু অনেক চেষ্টা করেও সে ওষুধ আনাতে পারলেন না, বা সে পথ্যে ধীরেনবাবুকে রাজি করতে পারলেন না।

৩৩

ধীরেনবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আজ বড় হট্টগোল। যাঁরা তাঁর বাড়ীটা নিলামে কিনেছেন, তাঁরা ঢাক-ঢোল এনে ঘটা করে বাড়ীর দখল নিচ্ছেন। আদালত থেকে পেয়াদা আনিয়েছেন। এছাড়া তাঁদের ঝুড়ি ঝুড়ি টাকার বিনিময়ে যে সব দরওয়'ন মানুষ খুন করতে পারে, এমন সব গালপাট্টা-ওয়ালা আত্মীও এসেছে অনেক, নিরীহ নির্ব্বিকার ধীরেনবাবুকে বাড়ী-ছাড়া করতে।

অতুল বাবু প্রায়ই চোখে কাপড় দিচ্ছেন,—কিন্তু যার জন্যে তিনি এত অশ্রু ত্যাগ কচ্ছেন,—তিনি অচল, উত্তেজনা-হীন, বিষাদ-গম্ভীর!

দু'বার ঢোল বাজলো, পাড়ার লোকও অনেক এসে জমা হলো। ধীরেন বাবু আস্তে আস্তে বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সম্মুখের উঠোনটায় দাঁড়ালেন। ক্রেতা ও আদালতের পেয়াদারা তাতেও আপত্তি করাতে তিনি অবশেষে পথের ওপরেই চলে এলেন। হাত দু'খানা খালি! পরনে মাত্র একখানা অর্ধ মলিন কাপড়! অতুল বাবুও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, তবে তাঁর হাত খালি নয়; কতকগুলো লাল খেরোয় বাঁধানো খাতার বোঝা!

এমন সময়ে খুব জোর একবার ঢোল বাজলো ও একজন পেয়াদা আদালতের নিলাম-পরোয়ানা খুব জোর কণ্ঠস্বরে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রে জানিয়ে দিলেন। ধীরেনবাবুর মুখের মাংসপেশী একটাও একটুকু কুঁচকালো না বা কোনও শিরা কপালের ওপর খাড়া হয়ে উঠলো না।

ঠিক সেই সময়ে এক মিলিটারী পোষাক-পরিহিত যুবাপুরুষ হাতে একটা চাবুক ও পেছনে একটা মুটের মাথায় সুট্‌কেস্ নিয়ে সেখানে হাজির হলো। তার গায়ের কোটের ওপর চারটে রুপোর তারা ঝলমল কচ্ছে, ও মাথায় পিতলের ছাট্‌ জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে বড় সোজা-লোক নয়, যুদ্ধে কত যে জার্মানকে সে ভব-নদীর পারে পাঠিয়ে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পায়ে মিলিটারি ধরণের মোটা সোল-ওয়ালা জুতো আর হাঁটু পর্য্যন্ত উঠেছে ফুল মোজা! খাকির হাফ প্যাণ্ট্ দেহের মধ্যদেশ আবরণ করেছে। সে এসে, এতো ভিড় দেখে, জিজ্ঞাসা করলো: "আমাদের বাড়ীর সুমুখে এতো ভিড় কেন?"

কে একজন চাপাগলায় মুখ লুকিয়ে বললে: "বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে!"

"সে কি? বিক্রি হ'লো কেন?"

অতুলবাবু ছিলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে। আগন্তুক মিলিটারী যুবা তার মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিতেই, তিনি তাকে চিনে ফেললেন। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে বললেন: কে খোকন-বাবু? ভাইরে! আমাদের শেষ-সম্মানটা রক্ষা করো!

তারপর দু'জনের মধ্যে অনেক আলাপ, কথাবার্ত্তা হলো। অতুল বাবু অল্প কথায় সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন খোকনবাবুকে!

খোকন সব শুনে তার ভিতরকার সার্টের পকেট থেকে একটা মনি-ব্যাগ্ বার ক'রে, আটখানা এক হাজার টাকার নোট অতুলবাবুর হাতে গুঁজে দিলেন। (যে সময়ের কথা লেখা হচ্ছে, সে সময়ে হাজার টাকার

নোট চলতি ছিল। সে নোট, বছর দুয়েক হ'লো পরলোক-প্রাপ্ত হয়েছে!)

নোট ক'খানা অতুলবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে খোকন বললো: "কোর্টে জমা দিয়ে দিন টাকাটা! আর এই সব খেঁকি কুকুরগুলোকে কিছু কিছু মাংসের টুকরো দিয়ে, বিদেয় ক'রে দিন। ওরা মানুষের সম্মানের চেয়ে টাকাটাই বেশী ভালবাসে!"

ব'লেই খোকন সেখান থেকে সরে গেলো ও নিজের বাড়ীর মধ্যে বুটের খট্ খট্ শব্দ করতে করতে ঢুকে গেল। যারা এতক্ষণ বাড়ী দখল নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, তারা হঠাৎ এক মিলিটারি পোষাক-পরা লোককে আসতে দেখে প্রথমটা একটু থতমত খেয়েছিল, এবং এখন অতুলবাবু এসে তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিতেই, তারা তাদের কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে,—একটু একটু ক'রে পেছন হটতে হটতে—একেবারেই সরে পড়লো। স্থানটা দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লোক-বিরল হয়ে গেল।

ধীরেন বাবু এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন, একদিকে! নিতান্ত বোকা হাবার মতো এখন তাঁর মুখের ছাপ, চক্ষু একেবারেই লক্ষ্য-হীন। অতুল বাবু এসে বললেন: চলুন, বাড়ীর ভেতরে চলুন।

তাঁর হাত ধরে, এক রকম প্রায় জোর করেই অতুলবাবু তাঁকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন ও তাঁর অভ্যস্ত ঘরে শুইয়ে দিলেন।

(৫৪)

অসুস্থ ব'লেই হোক্,—কি নিরপেক্ষতা বশতঃই হোক, ধীরেন বাবু বিছানায় শুয়ে একটু যেন ঘুমিয়ে পড়লেন; স্বপ্ন দেখলেন অতি

চমৎকার! সেই ছেলে-বেলাকার অমিতা,—সেই ফুটফুটে চৌদ্দ বছরের মেয়েটি,—যেন তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলচে: আমায় বিয়ে করতে চাইচো কেন? আমিতো তোমাকে আমার ছেলেটি দিয়েছি! তবে আবার আমায় চাইচো কেন?

ধীরেন তার কথায় উত্তর দিলেন: কই, তোমার ছেলেতো আমার আপনার হলো না? তুমি তাকে কি মন্ত্রণা দিলে, তাইতে তো সে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল!

স্বপ্নের মাঝখানে অমিতা যেন বলচে: আমার স্বামীর ঋণ যে তালো-কাঁর শোধ হয়নি, তাইতে সে চলে গেল।

ধীরেন যেন বললো: তোমার স্বামীর ঋণ অনেকদিন শোধ হয়ে গেছে।...আমি ছাড় পত্র লিখে দিচ্ছি।...তোমার ছেলেকে বলো, আমার কোলে ফিরে আসতে।

অমিতা যেন বললো: আচ্ছা বলচি।

এমন সময়ে ছ্যাৎ করে তাঁর স্বপ্নটা ভেঙে গেল। ধীরেনবাবু চোখ খুলে দেখেন, সম্মুখে দাঁড়িয়ে খোকন। কিন্তু তাঁর ছেলে খোকন নয়। মিলিটারি পোষাক-পরা, ঠিক খোকনের মত দেখতে, একটি লোক। বোধ হয়, অমিতার ছেলে।

খোকন বললো: কাকা বাবু, আপনি উঠে বসুন। আমি আপনার পায়ের ধূলো নেবো।

'কাকা বাবু!' তা'হলে সত্যিই তো তার খোকোন নয়! অন্য-কোনও অপরিচিত ভাইপো! ধীরেন বাবু খোকোনকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবার জন্যে একবার মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু 'কাকা বাবু' ডাক শুনতেই তাঁর সমস্ত উৎসাহ ঝড়ের মুখে প্রদীপের মত নিভে গেল। ধীরেন বাবু মুখ বেঁকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

[illegible]-বাবু সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি বললেন, 'বাবু, খোকোন এসেছে আপনাকে নমস্কার করতে'।

ধীরেনবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। যেন, কথাটা তিনি শুনতেই পান নি!

খোকনের মনে হঠাৎ কি হলো। সে খুব বুদ্ধিমান যুবক। হঠাৎ তার মনে হলো, তার প্রতিপালক পিতার মনে কোথায় কাঁটা ফুটেছে। কাঁটাটা যে কি, তা তার বুঝতে দেরি হলো না। সে কথা সামলে নিয়ে বললে:—

"বাবা? বাবা! আমাকে মাপ করুন."

স্বইচ্ টিপে দিলে বিদ্যুতের আলোক যেমন করে জ্বলে ওঠে, 'বাবা' নাম শোনবা-মাত্রই ধীরেন-বাবুও তেমনি হঠাৎ আনন্দের প্রস্ফুরণে লাফিয়ে উঠলেন এবং খোকনকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন

"তোমার স্বামীর ঋণ শোধ হয়েছে, শোধ হয়েছে মা-দেবতা! তুমি দেবী! তোমাকে নমস্কার!"

খোকোন ধীরেন-বাবুর পায়ের ধূলো নিল।